রেশালার বাবু

লীলা মজুমদার

অলঙ্করণ : সমীর সরকার

সম্পূর্ণ উপন্যাস

আমার নাম দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার বাবার নাম শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি ৬-সংখ্যক ইরেগুলার অশ্বারোহী রেজিমেন্টে কাজ করতেন। বদলির চাকরি, তাই ছোটবেলা থেকেই বাবার সঙ্গে ভারতবর্ষের নানান জায়গায় ঘুরবার সুযোগ পেয়েছিলাম। দুঃখের বিষয়, আমার বয়েস যখন সবে ১৫, বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। তিনটে ছেলে নিয়ে মা চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। ছেলেদের মধ্যে আমিই বড়।

বাবা যে একেবারে কিছুই রেখে যেতে পারেননি, এমন নয়। কিন্তু আমাদের নেহাৎ ছেলেমানুষ মনে করে, মা সে-বিষয়ে আমাদের কাছে কখনও কিছু

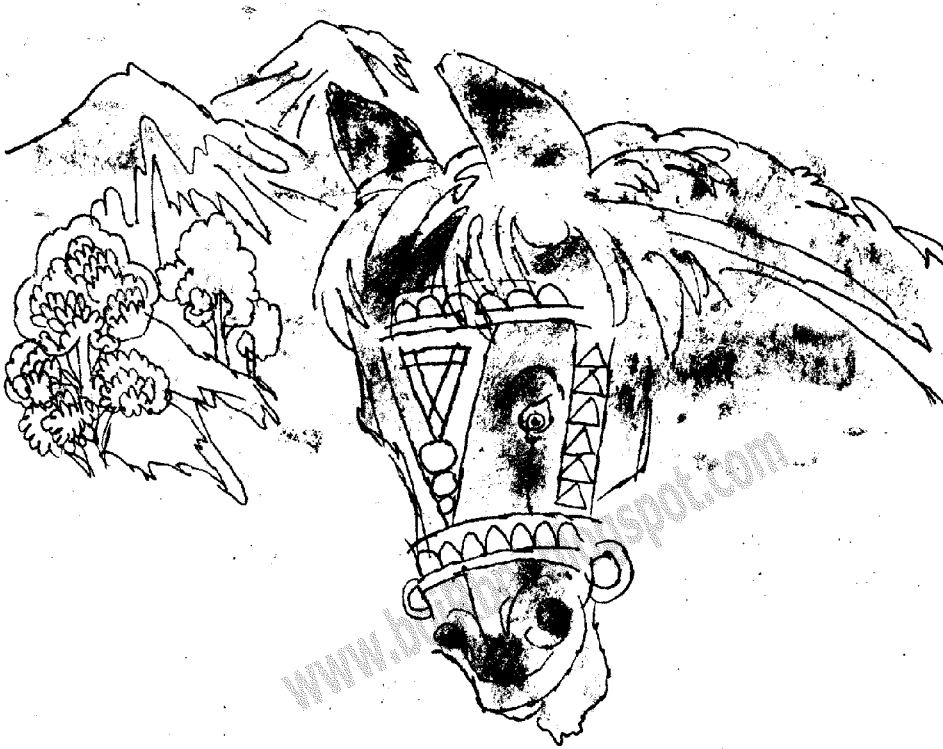

www.boiRboi.blogspot.com

বলতেন না। খালি কাঁদতেন আর বলতেন, 'হায় ভগবান! কী করে সংসার চালাব?' মনে মনে ঠিক করে ফেললাম—আর পড়াশোনো করে কাজ নেই। যেমন করে হোক একটা চাকরি জুটিয়ে, মা ও ভাইদের ভার নিতে হবে।

আমরা সে-সময়ে কাশীতে থাকি। সেখান থেকে সাত মাইল দূরে, সুলতানপুর বলে একটা জায়গায়, ৮-সংখ্যক ইরেগুলার অশ্বারোহী রেজিমেন্টের ছাউনি ছিল। একদিন শুনলাম ওখানে একটা চাকরি খালি আছে। বাড়িতে কিছু না-বলে, স্কুল থেকে একটা সার্টিফিকেট আর বাবার দু'-খানা প্রশংসাপত্র নিয়ে, গেলাম সেখানে।

'লোক নেওয়া হয়ে গেছে।' এই বলে আপিসের বড়বাবু আমাকে ভাগাবার চেষ্টা করলেন। আমি কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানলাম রেজিমেন্টের বড়সায়েবের নাম লেফটেনেন্ট বীচার, গেলাম তাঁর কাছে।

তিনি বাবাকে চিনতেন। সব কথা শুনে, যে-বিভাগের চাকরি, সেখানকার বড়সায়েবের কাছে আমাকে নিয়ে বললেন, 'যে-লোককে তোমরা ঠিক করেছ, তাকে কি ভালো করে চেনো?'

সায়েব বললেন, 'আমাদের বড়বাবু তাঁকে এনেছেন, তাঁকে পরীক্ষা করা হয়নি।'

বীচারসায়েব বললেন, 'বেশ। তাহলে তোমার বাবুর আর আমার বাবুর পরীক্ষা হোক। যে ভালো, তাকেই নেওয়া হবে।'

আমরা দু'জনে পরীক্ষা দিতে বসলাম। পরীক্ষা মানে শ্রুতি-লিখন। বীচারসায়েব গড়গড় করে একটা ইংরিজি বই পড়ে গেলেন, আমিও চটপট লিখে গেলাম। ওদিকে বড়বাবুর লোকটি প্রথম ও শেষ কথাটা লিখে চুপ করে বসে রইলেন। কাজেই মাসিক ৪০ টাকা মাইনেতে আমিই কাজে বহাল হলাম। কিন্তু বড়বাবু সেই থেকে আমার ওপর চটে রইলেন।

চাকরিটা সুলতানপুরে নয়। বদলির হুকুম এসে গেছে, যেতে হবে পাঞ্জাবে, হান্সি বলে একটা জায়গায়। জিনিসপত্র কিনতে হবে, বাড়িতে মায়ের আর ছোট ভাইদের ব্যবস্থা করতে হবে, অথচ হাতে একটা পয়সা নেই। সে-কথা শুনেই সায়েব আমাকে তিন মাসের আগাম মাইনে, আর তার ওপর নিজের থেকে ৩০ টাকা দিলেন। মহা খুশি হয়ে মা-র কাছে সুখবর দিতে চললাম।

মিলিটারি চাকরির কথা শুনে মা কিন্তু কেঁদেই সারা। বার বার বলেন, লেখাপড়া ছেড়ে এই অল্পবয়েসে পয়সা রোজগার করার কোনও দরকার নেই। যা সামান্য সংস্থান আছে, তাই দিয়েই আরও ক'টা বছর চলে যাবে। আমিও নাছোড়বান্দা, সায়েবকে কথা দিয়ে এসেছি, হান্সি আমি যাবই। আমার জেদ দেখে মা ভাবলেন, কী জানি, বাধা দিলে শেষটা হয়তো পালিয়ে যাবে! কাজেই শেষপর্যন্ত মত না-দিয়ে পারলেন না। শেষদিন ষোড়শোপচারে রান্না করে আমাদের তিন ভাইকে পাশাপাশি বসিয়ে খাওয়ালেন।

তখন রেল ছিল না, পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে মিলিটারির লোক যাতায়াত করত। পথে আলিগড় পৌঁছে, বীচারসায়েব আমাকে তাঁর নিজের হিসেব রাখার কাজও দিলেন, তার জন্যে মাসিক আরও ১৫ টাকা ধার্য হল। তাছাড়া রেজিমেন্টের হাসপাতালের হিসেব রাখার জন্যে ১৫ টাকা আর ইংরেজ অফিসারদের মেসের হিসেবের জন্যে ১৫ টাকা—হান্সি যাবার পথেই আমার এই ৪৫ টাকা আয় বাড়ল।

দেখতে দেখতে কাজে মন বসে গেল। প্রশংসাও পেলাম যথেষ্ট। মাস চারেক বাদে মা-কেও হাল্সিতে নিয়ে এলাম। আয় আরও ২০ টাকা বাড়ল। সিপাইদের চিঠির ওপরে যা-কিছু লিখতে হত, সে-সব ছিল বড়বাবুর কাজ। তার জন্যে তিনি ২০ টাকা করে পেতেন, কিন্তু কাজটা আমাকে দিয়ে করাতেন। এদিকে বড়সায়েব আমার লেখা চেনেন, কাজেই ওই ২০ টাকাও শেষপর্যন্ত আমিই পেতে লাগলাম। বড়বাবু চটে লাল।

চমৎকার শরীর ছিল আমার। ভালো জায়গায় থাকি, ভালো খাই-দাই। ঘোড়ায় চড়ি, তলোয়ার খেলি, বন্দুক ধরি। গড়গড় করে বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানি ভাষা বলি, পাজামা কুর্তা পরি, দেখে বাঙালি বলে চেনার জো ছিল না। ঘোড়ায় চড়বার ইশকুলে ভর্তি হয়ে এত ভালো অশ্বারোহণ শিখলাম—দেখে শুধু সিপাইদের কেন, ইংরেজ অফিসারদের এবং তাঁদের মেমদের পর্যন্ত তাক লেগে যেত। রেশালার বাবু আমি, তার উপযুক্ত হওয়া চাই তো! রেশালা মানে ঘোড়সোয়ারের ফৌজ।

এমনি করে দু'-বছর কেটে গেল। তারপর আমাদের রেজিমেন্টের বর্মা যাবার হুকুম এলো। মা তো বেজায় আপত্তি করতে লাগলেন। বাস্তবিক, সেকালে বিলেত যাওয়াও যা, বর্মা যাওয়াও তাই। হাল্সি থেকে বাংলাদেশে হাঁটাপথে আসতে তখন তিন মাস লাগত। তারপর কলকাতা থেকে জাহাজ চেপে রেঙ্গুন যেতে হত। এদিকে আমার দেশ দেখবার ইচ্ছে ষোলো আনা ছিল। অনেক কষ্টে মা-কে বোঝালাম, ওখানে গেলে কাজে অনেক উন্নতি হবে, ভালো খাব থাকব, শরীর ভালো হবে, দেখতে দেখতে ফিরে আসব ইত্যাদি। অবশেষে মা-র অনুমতি পাওয়া গেল। এদিকে বড়বাবুর বর্মা যেতে আপত্তি, শেষ অবধি তাঁর কাজও আমার ঘাড়ে নিতে হল। মা আর দুইভাইকে মথুরায় এক আত্মীয়ের কাছে পাঠিয়ে, ১৮৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রেজিমেন্টের সঙ্গে বর্মা যাবার জন্যে কলকাতার দিকে রওনা হলাম।

কলকাতায় পৌঁছে গঙ্গার ধারে তাঁবু করে প্রায় মাসখানেক আমরা ছিলাম। সংখ্যায় নিতান্ত কম ছিলাম না। ৫৮৪জন ঘোড়সোয়ার, চারজন ইংরেজ কর্মচারী আর মেলা লোক-লস্কর। এক-একবারে এক-এক জাহাজ আসে, আর শ'-খানেক লোক নিয়ে রওনা হয়ে যায়, এইভাবে পাঁচটা জাহাজে রেজিমেন্ট বর্মা চলল। শেষ জাহাজে লেফটেনেন্ট ম্যাকেঞ্জি ও ১০০ সোয়ারের সঙ্গে আমিও ছিলাম।

জাহাজটার নাম 'আগাবাকা'। একটা স্টিমার তাকে টেনে নিয়ে চলল। বিরাট জাহাজ, চারতলা বাড়ির সমান উঁচু, ভেতরটাকে একটা গোটা গ্রাম বললেও বেশি ভুল হয় না। নীচের তলায় লোকলস্কর, জিনিসপত্র আর ১২৫টা ঘোড়া। একদিন একটা ঘোড়া ভয় পেয়ে এমনি খেপে গেল, যে ছুটোছুটি করে জিনিসপত্র ভেঙে, লোক জখম করে, একাকার কাণ্ড বাধাল। শেষপর্যন্ত তাকে গুলি করে মারতে হল। যখন তার অত বড় সুন্দর শরীরটাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হল, তখনও বোধহয় প্রাণ বেরোয়নি, দেখে আমার যে কী কষ্ট হয়েছিল!

আর-একবার খাবার জল নিয়ে ভারী গোলমাল বেধেছিল। বড় বড় হাঁড়ায় পানীয় জল রাখা ছিল। তার থেকে সব জাতের লোকই তেষ্টা মেটাত। এই নিয়ে হিন্দু-সিপাইরা মহা আপত্তি জানাল। শেষপর্যন্ত তাদের জন্যে আলাদা জলের ব্যবস্থা বরতে হল।

জাহাজে আমার থাকবার জন্যে ছোট-একটা কামরার ব্যবস্থা হয়েছিল। পাছে জাহাজের দোলায় আমার গা-বমি করে—ইংরিজিতে যাকে সী-সিক হওয়া বলে—তাই সায়েব আমাকে

www.boiRboi.blogspot.com

সর্বদা শুয়ে থাকতে বলেছিলেন। তাই কি আমি পারি? ইদিক-উদিক তাকিয়ে দেখি জাহাজের পেছনে একটা ছিপ বাঁধা, কয়েকজন লোক তাতে চড়ে তোপসে মাছ ধরতে যাচ্ছে। আমি ততক্ষণ উপোস করে আছি শুনে তারা আমাকে ডাকল, আমিও তরতর করে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নৌকোয় হাজির। তারা রাঁধবার বাসনপত্র গঙ্গাজলে ধুয়ে, রান্নার সমস্ত জোগাড় করে দিল। আমি দিব্যি রেঁধে-বেড়ে খেলাম। তারপর জাহাজটা তাদের মাছ ধরবার জায়গায় পৌঁছে গেলে, আমি আবার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম, ওরা মাছ ধরতে গেল। ওপর থেকে ওদের দিকে একবার তাকিয়ে আমার মাথা ঘুরতে লাগল।

এর আগে কখনও সমুদ্র দেখিনি। সমুদ্রের ঘোর নীল জল, সাদা ফেনার ঝুঁটিপরা বিশাল বিশাল ঢেউ, জলের ওপর সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, চাঁদ-ওঠা, কোথাও মেঘের খেলা, জাহাজের চাকা জল কেটে যাচ্ছে আর হাজার হাজার বুদ্বুদ উঠছে—তাতে রোদ পড়ে রঙ ধরছে, যেন হাজার হাজার মণিমুক্তো-প্রবালরত্ন।

এইসব দেখতে দেখতে ১১ দিনে আমরা রেঙ্গুন পৌঁছলাম। দশদিন পরে ছোট-স্টিমারে ছোট-জাহাজ বেঁধে ইরাবতী নদী ধরে, থিয়েউমউ বলে একটা জায়গায় পৌঁছলাম, সেইখানে আমাদের ক্যাম্প হল। আগের মুলুক বলতে যা বুঝতাম, দেখলাম জায়গাটা ঠিক তাই। মজার কথা হল সেখানেও কোন্নগরের এক বাঙালি ভদ্রলোক গোমস্তার চাকরি করতেন, আমি বাঙালি শুনে, ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে, ভারী আদর-যত্ন করলেন।

ওখানে দেখলাম সবই অন্যরকম। পুরুষরা ধুতি পরে, তাকে বলে 'পোছো'। বহরে দু'-হাত, লম্বায় পনেরো হাত, কোমরে গিঁট দিয়ে একবার গায়ের চারদিকে জড়িয়ে এনে, সমস্ত কাপড়টাকে তালগোল পাকিয়ে, সামনে একটা বিরাট পুঁটলি বানিয়ে রাখে—সে যা দেখতে হয়! হাঁটু থেকে কোমর অবধি সব উল্কি পরে, আবার বুঝিয়ে বলে, 'এই-যে যন্ত্রটা আঁকা দেখছ, এটা থাকলে সাপে কামড়ায় না, এইটি থাকলে জলে ডোবে না আর এইটে থাকলে আগুনে পোড়ে না...' ইত্যাদি।

মেয়েদের দেখলাম অবাধ স্বাধীনতা। মাথায় ঘোমটা দেয় না। সবার সামনে বেরোয়, খোঁপায় ফুল গুঁজে, হাতে গলায় রঙিন রেশমি রুমাল বেঁধে বাহার দেয়। হাট-বাজার কাজকর্মের বেশিরভাগ মেয়েরাই করে। ওরা সবরকম জিনিস খায়, জন্তু-জানোয়ার কিছু বাদ দেয় না। এঁটো জ্ঞান নেই, সবাই মিলে এক থালায় খায়। মাছ পচিয়ে মশলা মাখিয়ে মাটিতে পুঁতে 'ঙাপ্পি' বলে একরকম আচার বানায়, সব কিছুতেই তাই মেখে খায়। অথচ ভালো ঘিয়ের গন্ধে ওদের বমি আসে!

দেখবার জিনিস প্রচুর ছিল বর্মায়। সোয়েডেগঁঙ প্যাগোডা বা মন্দির দেখেছিলাম, কুচকুচে কালো আবলুশ কাঠের থামের ওপর বসানো। ৭০-৮০টা সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরের চত্বরে উঠতে হয়। আবলুশ কাঠের থাকগুলোর ওপর সোনালি নকশা করা। বিশাল মন্দির, তার ঘণ্টাটাই এত বড় যে ৪০-৫০জন লোক তার মধ্যে অনায়াসে ঢুকে যায়। একটা মুগুর দিয়ে ঘণ্টা পেটানো হয়—তার যা আওয়াজ, কান ঝালাপালা হয়ে যায়।

বর্মায় থাকায় সময় উপরি-রোজগারের ভারী সুবিধে ছিল। একদিন নদীর ধারে কাস্টমস আপিসে গিয়েছিলাম, তাদের হিসেব-খাতার ছিরি দেখে হাসি চাপতে পারিনি। অঙ্কের মিল

নেই, ভুলে ভর্তি। আমার হাসি দেখে ওখানকার সায়েব বললেন, 'বাবু, রোজ এক ঘণ্টা করে হিসেব দেখে যাও, মাসে মাসে ১০০ টাকা দেব।' আমার খুব লাভ হয়ে গেছিল।

১৮৫৬ সালে দেশে ফেরার হুকুম এলো আমাদের। ফিরে এসে আড়াই মাস ব্যারাকপুরে ছিলাম, তারপর আবার সুলতানপুর। এই সময় আমার বিয়ে হয়। তারপর ১৮৫৬ সালের নভেম্বর মাসে বেরিলি যাবার হুকুম এলো। এইখানেই আমার জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চময় ঘটনার শুরু হয়েছিল।

বেরিলি শহরটা দিল্লি থেকে ১৫২ মাইল দূরে, আর কলকাতা থেকে হাঁটাপথে ৭৮৮-র কম নয়। তখন রেলের লাইন সবে পড়তে আরম্ভ করেছে, কলকাতা থেকে মাত্র রানিগঞ্জ অবধি গিয়েছে। আমাদের রেশালা গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড দিয়ে হাঁটা-পথে চলল—এইরকম যাত্রাকে সেকালে 'রেশলার কুচ' বলত। সে-এক এলাহি ব্যাপার! সব নিয়ে এক হাজার লোক, এক হাজার ঘোড়া, তাছাড়া উট, গাধা, গোরু—এরা রোজ নিয়ম করে পথ চলবে, খাবে-দাবে বিশ্রাম করবে। শুধু তাই নয়, সায়েবদের সঙ্গে মেমসায়েব, ছেলেমেয়ে, আয়া, বেয়ারা, বাবুর্চি। ছক্কড়গাড়ি, এক্কাগাড়ি। এইরকম প্রত্যেক দিন হাজারের বেশি লোকের যাবতীয় ব্যবস্থা চাই—এক মাস, দু'মাস, এমনকী তিন মাস ধরে।

আমাদের ৮ নং অশ্বারোহী দলে ছিল ৫০৪জন ঘোড়সোয়ার, তাছাড়া ইংরেজ ও দেশি অফিসার এবং জমাদার, দফাদার, ডাক্তার, বাজনদার, ভিস্তি, মেথর, বাহকের দল। প্রত্যেক দু'জন সোয়ারের একজন সহিস। প্রত্যেক সহিসের একটা ছোট টাট্টুঘোড়া। সোয়ারদের প্রত্যেকের নিজের ঘোড়া—তাদের জিনিসপত্র, তাঁবু ইত্যাদি যেত তাদের সহিসের টাট্টুর পিঠে। অফিসারদের তো কথাই নেই, প্রত্যেকের তিন-চারটে বড় ঘোড়া, সাত-আটজন সহিস, পাঁচ-ছ'টা টাট্টু, আর তাদের পিঠে প্রত্যেকের পাঁচ-ছ'টা তাঁবু।

কলকাতা থেকে আমাদের কুচ শুরু হবার আগে প্রত্যেকের কাছে ডাকে এলো একখানা 'পথের বিবরণী পুস্তিকা'। কোন পথে যাওয়া হবে, কোথায় কোথায় চটি, সে-সব চটি কোন কালেক্টারের অধীনে, কোথায় ঘোড়ার ঘাস পাওয়া যাবে, কোন তারিখে কোন চটিতে পৌঁছনো যাবে ইত্যাদি সমস্ত লেখা ছিল। কালেক্টারদের কাছে আগেই চিঠি যেত—এত সংখ্যক লোক, অফিসার জন্তু-জানোয়ার অমুক তারিখে তমুক জায়গায় পৌঁছবে, তাদের জন্যে এই-এই খাবার এবং এই-এই ব্যবস্থা চাই।

কুচ শুরু হবার আগেরদিন দু'-দল ঘোড়সোয়ার এগিয়ে গেল, এদের বলা হত 'লাইন ডুরি গার্ড'। তারা আগে গিয়ে ইংরেজ-কর্তার তাঁবু খাটিয়ে, আসবাব সাজিয়ে, চানের তাঁবু তুলে সব তৈরি রাখল। বড়সায়েবের তাঁবুর আশেপাশে ছোটসায়েবদেরও তাঁবু পড়ল, তারপর পড়ল দেশি অফিসারদের তাঁবু। প্রত্যেক তাঁবুর পাশে একটা করে নিশান পোঁতা হল, তাই দেখে যে-যার তাঁবু চিনে নিল, কোনও গোলযোগ হল না।

সঙ্গে সঙ্গে সায়েবদের রান্নার তাঁবু পড়ল। তার সামনে একটা মস্ত শামিয়ানা, তার তলায় মস্ত টেবিলের চারপাশে চেয়ার সাজানো হল। বাবুর্চিরাও রাঁধা-বাড়ায় লেগে গেল।

এখানেই লাইন-ডুরি-গার্ডের কাজের শেষ নয়। ঘোড়া থাকবার জায়গা চাই। দেশি অফিসারদের তাঁবু ফেলা চাই। সোয়াররা অবিশ্যি নিজেদের তাঁবু নিজেরা খাটাত। রেশালার খাবারদাবার সংগ্রহের জন্যে রসদ গার্ড থাকত। তাদের সঙ্গে ছ'জন হিন্দুস্থানি মুদি, এরা চাল,

ডাল, আটা, ঘি, নুন ইত্যাদি জোগাড় করে ছয় জায়গায় রাখত, সোয়াররা নিজেদের দরকার মতো সই দিয়ে খাবার জিনিস নিয়ে যেত। মাসকাবারে ওদের মাইনে থেকে বিল শোধ হত। যে-সব জিনিস বেনে-মুদিরা ছোঁবে না, সে-সব মুসলমান-খানসামারা সায়েবদের জন্যে কিনে আনত।

রোজ আমরা ১০-১২ মাইল চলতাম। কখনও আরও বেশি যেতে হত। সাধারণত ১০-১২ মাইল অন্তর একটা করে চটি পড়ত, কখনও কখনও আর-একটু বেশিও পড়ত। যেদিন বেশি দূর যেতে হবে, সেদিন একটু সকাল থাকতে রওনা হতাম। ঘোড়া ছোটাবার নিয়ম ছিল না, ধীর কদমে যেতে হত। চটিতে পৌঁছে বাকি দিনটা এবং সারারাত বিশ্রাম করে, আবার ভোরে রওনা হতাম।

আমাদের সঙ্গে চার-পাঁচশো সহিস যেত, তাদের একটা বড় কাজ ছিল ঘোড়ার ঘাসের ব্যবস্থা করা। এইজন্যে তাদের কাছে-দূরের মাঠে মাঠে ঘুরতে হত। এদের মাইনে বড় কম ছিল, স্বভাবও খুব ভালো নয়। খেতের শস্য নষ্ট করত, গৃহস্থের বাগান তছনছ করত। আবার ধরাও পড়ত, তখন বেদম শাস্তিও পেত।

শেষপর্যন্ত সুলতানপুর হয়ে আমরা যখন বেরিলি পৌঁছলাম, তখন ১৮৫৬ সালের শেষের দিক। আমার ২১ বছর বয়স, কিন্তু দেখে মনে হয় ২৬-২৭।

মহা সুখে ছিলাম বেরিলিতে প্রথম দিকে। পুরনো শহর, কিন্তু কোনও গড় বা বড় কেল্লা নেই। ছোট-একটা ছিল বটে, কিন্তু সেখানে সিপাই সৈন্য থাকত না, মাঝে মাঝে গোলা-বারুদ ইত্যাদি রাখা হত। শহর থেকে এক মাইল দূরে সেনা-নিবাস, তিনটে রেজিমেন্ট ছিল সেখানে। এক দল অশ্বারোহী, এক দল পদাতিক, আর-এক দল তোপ। আমি যদিও অশ্বারোহী দলে চাকরি করতাম, তবু পাঁচ টাকা ভাড়া দিয়ে পদাতিক সেনা-নিবাসের পেছনে একটা ভালো বাসা নিলাম। সবাই বলত অনেক বেশি ভাড়া দিচ্ছি, তবে বাসাটা বেশ ভালো ছিল। বৈঠকখানা, আর দু'খানা শোবার ঘর ছাড়াও, দুটো আস্তাবল, চাকরদের ঘর, রান্নাঘর, চানের ঘর ইত্যাদি ছিল।

সেই সময় বেরিলিতে ১২-১৪ ঘর বাঙালি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আমার বাসার কাছে থাকতেন, বাকিরা শহরের মধ্যে। এদের সকলের মধ্যে সদ্ভাব ছিল, দিব্যি মিলে-মিশে আনন্দে দিন কাটত। আমার বাসাটা একটা আড্ডার মতো ছিল, রোজ সেখানে গান, বাজনা, খেলা, গল্প। বাড়িতে মেয়েরা কেউ না-থাকলেও, চাকরবাকর ভালো ছিল। যেমন খেতাম, খাওয়াতামও তেমনি। জিনিসপত্র তখন খুব সস্তা। ভোরে উঠেই রোজ এক সের কাঁচা টাটকা দুধ খেতাম, টাকায় ৩০ সের করে পেতাম। নিউরিয়া বলে একটা জায়গা থেকে চাল আসত—সরু লম্বা দানা, রাঁধলে মল্লিকাফুলের গন্ধ বেরুত, দাম ছিল সাড়ে-তিন টাকা মণ! ভালো আটার দাম ছিল টাকায় ৩২ সের। আলুর সের দু'-পয়সা, ফুলকপি বাঁধাকপি তিন পয়সায় একটা। বিশাল সব আমগাছ, সবচেয়ে ভালো আম পাঁচ আনা থেকে আট আনা শ'। ২০০ আম কিনলে, দোকানদার জোর করে ১০০ ফাউ দিত। চাকর আপত্তি করলেও শুনতে চাইত না! তবে একবছর এইরকম আম হত, পরের বছর খুব কম, দাম উঠত চার-পাঁচ টাকা শ', আবার তার পরের বছর পথে-ঘাটে গড়াগড়ি!

বেরিলিতে আমার হাতে মেলা টাকা ছিল। সেগুলো রাখবার জন্যে কলকাতা থেকে ৭৫ টাকা দিয়ে একটা লোহার সিন্দুক কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। বর্মায় মাসে ৪০০ টাকার বেশি কামাতাম, অথচ খরচ প্রায় কিছুই ছিল না, আনবার সময় হাজার ১২ সঙ্গে আনলাম। তারপর পৈতৃক সম্পত্তি কিছু হাতে এলো, রোজগারও হল কিছু, সব নিয়ে লোহার সিন্দুকে ৩২ হাজার টাকা জমেছিল। বয়স আমার তখন ২১ বছর!

গান-বাজনার শখ ছিল, ১৫ টাকা মাসে মাইনে দিয়ে একজন মুসলমান ওস্তাদ রাখলাম। তিনি আমাকে সেতার শেখাতেন। ক্রমে দু'জন বন্ধুও সেতার শিখতে লাগলেন, তাঁদের জন্যেও দু'-খানা সেতার কিনলাম। গান-বাজনা খাওয়াদাওয়া—শহরময় আমার দান ও সৌজন্যের খ্যাতি ছড়িয়ে গেল। অনেক হিন্দুস্থানি বন্ধু হল—রাজা, জমিদার, উঁচু বংশের মুসলমানও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে খাঁ বাহাদুর খাঁর ঠাকুরদাদা একসময় রোহিলখণ্ডের নবাব ছিলেন। এঁর খুড়তুতো ভাই নিয়ামৎ খাঁ ও তাঁর ছেলে চুন্না মিয়াঁর সঙ্গে আলাপ হল। এঁদের অবস্থা তখন একেবারে পড়ে গেছে। চুন্না মিয়াঁর কোনও কাজ ছিল না, কেবল সেতার বাজাতেন। বছর ২৫ বয়স, ভারী সুপুরুষ।

থাকতাম একা, কিন্তু গাড়ি ছিল দুটো, তিনটে ঘোড়া। আর সহিসকে ধরে ১১জন চাকরবাকর। আর ছিল আমার একটা খাতা, তার ওপর লেখা ছিল : 'বন্ধুত্বের খাতিরে ধার দেওন'। আমার ৩২ হাজার টাকার মধ্যে ২০ হাজার ধার খাটত, সুদ পেতাম মাসে আট-ন'শো টাকা। সবই বিশ্বাসের ওপর হত, খাতায় নাম-সই দিয়ে লোকে টাকা নিয়ে যেত, শোধ দিলে নাম কেটে দেওয়া হত। এইভাবে বহু মানুষকে সাহায্য করতে পারতাম। শেষপর্যন্ত ইংরেজ অফিসার থেকে শুরু করে সিপাই, চাকর, নফর, ভিস্তিওয়ালা—সকলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়েছিলাম।

সাধারণত সিপাইদের জীবনযাত্রা খুবই সাদাসিধে ছিল। মাইনে পেত তারা মাসে সাত টাকা, শেষপর্যন্ত বেড়ে ন'টাকা অবধি উঠত, তার বেশি আর নয়। ওই মাইনে থেকে পোশাকের জন্যে কিছু টাকা কাটা যেত। খাওয়া অতি সাধারণ, ডাল আর রুটি। তাতেই তারা খুশি, নিদেন একটু ঘি নিল, মাঝে মাঝে কচু, আলু, বেগুন। রান্নার জন্যে কাঠ অনেক সময়ই ওরা কিনত না, খুঁজেপেতে কুড়িয়ে আনত।

ওদের জীবনও খুব সুখের ছিল না। ভোরে অন্ধকার থাকতেই 'উর্দি' বা উঠবার বিউগল বা বাঁশি বাজত, ইংরিজিতে যাকে বলে 'ট্যাটু'। বাঁশি থামলেই দামামা শুরু হত। সিপাইরা ধড়মড় করে উঠে, প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে, পোশাক পরে, বন্দুক ধরত। দ্বিতীয়বার বাঁশি বাজলেই সবাই প্যারেড গ্রাউন্ডে হাজির হত। সেখানে সমর-কৌশল শেখানো হয়, নানান খেলা করে শীতকালেও সবাই ঘেমে-নেয়ে ওঠে।

তাছাড়া সিপাইদের গার্ড বা পাহারা দিতে হত। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যেকের আট ঘণ্টা পাহারা ডিউটি। দু'-ঘণ্টা পাহারার পর চার ঘণ্টা বিশ্রাম, তারপর আবার দু'-ঘণ্টা পাহারা, এইভাবে চলত। পাহারা দেওয়া খুব সহজ কাজ নয়। বন্দুকটা বুকের কাছে সোজা উঁচু করে ধরে, নির্দিষ্ট জায়গায়, নির্দিষ্টভাবে পা পেলে কেবল পায়চারি। একবার বসলেই কঠিন শাস্তি। একটু ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত বারণ।

এর ওপর সিপাইদের অফিসারদের আরদালির কাজও করতে হত। কিন্তু দিনের কাজ শেষ হলেই গান-বাজনা, রামায়ণ-পড়া, মুগুর ভাঁজা, কুস্তি খেলা, ধনুক টানা ইত্যাদি।

২

বেশ আনন্দে দিন কাটছিল। কিন্তু ১৮৫৭ সালের মাঝামাঝি থেকে কেমন যেন মনে হত সিপাইদের মেজাজ বড় গরম। কথায় কথায় তারা তেড়িয়া হয়ে ওঠে, জিজ্ঞেস করলেও কারণ বলে না। হঠাৎ একদিন গুজব উঠল—ইংরেজরা হিন্দু-মুসলমান দু'-দলেরই ধর্ম নষ্ট করবার জন্য গোরু আর শুয়োরের চর্বি মাখিয়ে বন্দুকের টোটা তৈরি করছে, সেই টোটা দাঁত দিয়ে কাটলেই তাদের ধর্ম নষ্ট হয়। কী পদাতিক কী অশ্বারোহী, সবার মুখে এক কথা। কিন্তু কে কবে ওই টোটা দাঁত দিয়ে কেটেছে, কিম্বা কাউকে কাটতে দেখেছে, তা কেউ বলতে পারে না!

অথচ এই ব্যাপার নিয়ে মহা আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। সিপাইরা খোলাখুলি বলতে লাগল, 'আর আমরা বন্দুক ঘাড়ে করে প্যারেড করব না।' কথাটা আমাদের কম্যান্ডিং অফিসারের কানে তুললাম। তিনি মহা চিন্তিত। বললেন, 'বাবু, এ-সব কথাই আমি জানি। এখন কী করে এদের ঠাণ্ডা করা যায়, বলুন তো? শুধু বেরিলিতে না, সব জায়গায় এই আন্দোলন শুরু হয়েছে।'

অশ্বারোহীরা ততটা না-হলেও, পদাতিক আর তোপখানার সিপাইরা খেপে আগুন হয়ে ছিল, বোঝাতে গেলে উল্টে বলে—'বাঙালিরা ইংরেজদের সঙ্গে একজোট হয়েছে!' সায়েবকে বললাম যে পদাতিক আর তোপখানার সিপাইরা সম্ভবত বিদ্রোহ করবে, ইংরেজ মহিলা ও ছেলেমেয়েদের কোনও নিরাপদ জায়গায় পাঠানো উচিত। সায়েবরা গোপনে পরামর্শ করে, চারদিনের মধ্যে মহিলাদের আর ছেলেমেয়েদের নৈনিতাল পাহাড়ে পাঠিয়ে দিলেন। গ্রীষ্মকাল পড়ে গেছে, ব্যাপারটা কিছু দৃষ্টিকটুও হল না।

আরও একমাস কাটল, সিপাইদের মেজাজ আরও গরম হয়ে উঠল, সায়েবরা খুবই চিন্তিত হলেন। আমারও মুশকিল, প্রায় ১৬ হাজার টাকা ধারে খাটছে, সিপাইরা আর শোধ দেবার কথা কানে তোলে না—যদিও তাদের সঙ্গে বরাবরই আমার সদ্ভাব ছিল! বেশি কিছু বললে আবার উল্টে হুমকি দেয়। সায়েবরাও ধার নিয়েছিলেন, কিন্তু এই বিপদের সময়ে সে-টাকা চাই কী করে?

মে মাসের গোড়ায় একটা গোপন সভায় দেশি উচ্চপদস্থ অফিসারদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'সব সিপাই কি বিদ্রোহ করবে?'

তাঁরা বলেছিলেন, 'না-না, তাই কখনও হয়! তাছাড়া শিগগিরি কিছুই হবে না। ওদের নিজেদের মধ্যেই বিষম মতের অমিল।'

অশ্বারোহী সেনার মেজর মহম্মদ সফি বললেন, 'কোনও ভয় নেই। পদাতিকরা বিদ্রোহ করলেও, আমরা পাঁচ-ছ'শো জন আছি, ওদের টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলব।' এ-কথা শুনে সায়েবরা খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। গভর্নমেন্টকে তাঁরা লিখলেন যে অশ্বারোহীদের সংখ্যা দ্বিগুণ করে দিলে, এ-অঞ্চলে কোনও ভয় নেই।

www.boiRboi.blogspot.com

অশ্বারোহী নেওয়া হবে শুনে দলে দলে লোক আসতে লাগল। অন্য সময় তাদের দুশো টাকা জমা দিতে হত ঘোড়া কিনবার জন্য, এখন উল্টে তাদের হাতে দুশো টাকা দেওয়া হল ঘোড়া কিনে আনবার জন্যে। কেউ কেউ টাকা নিয়ে ভেগে পড়ল, বাকিরা রুগ্ন পঙ্গু অকেজো সব ঘোড়া এনে হাজির করল!

এই টাকা দেওয়ার ব্যাপারে আমার কাজ বেড়ে গেল। ততদিনে আমার মেজভাই কাশীপ্রসাদও কমিশনার আপিসে চাকরি নিয়ে বেরিলিতে এসে গেছে, তাকে বললাম, 'ভাই, তোমার কাজ বন্ধ রেখে, এ-সময়ে আমায় একটু সাহায্য করো দেখি।' সে তাই করল, তবু অর্ধেক রাত জেগে কাজ শেষ করতে হত। সায়েব অফিসাররা তাই দেখে মহা খুশি।

এর পরে দেখি সায়েবরাও তেমন মন খুলে কথা বলেন না, বুঝে উঠি না কেন এমন হল। সকলের ঘরে দেখি দু'-চারটে ঘোড়া সাজানো থাকে, কিছু জিনিসপত্র বাক্সবন্দি হয়ে তৈরি। বড়ই ভাবনায় পড়ে গেলাম।

১৮৫৭ সালের ৩১-এ মে মাসকাবারের হিসেব দাখিল করতে হবে। কাশী আর আমি খাতাপত্র নিয়ে অ্যাডজুটেন্টসায়েবের বাড়িতে বেলা সাড়ে-দশটায় হাজির হলাম। দেখি আপিসের দরজায় তালা, কেউ কোথাও নেই। চারদিক ঘুরে কারও দেখা পেলাম না, শুধু সায়েবের সহিসটা একজায়গায় গুঁড়ি মেরে বসে আছে। সে-বেচারা ভয়েই আধমরা। তার কাছে শুনলাম সিপাইরা বিগড়ে গেছে, সায়েব ঘোড়ায় চড়ে পালিয়েছে, আমরাই-বা কেন মরতে বসে আছি!

কী যে করি, ভেবে পেলাম না। সঙ্গে তো একটামাত্র টাকা! ওদিকে বিদ্রোহীরা এখন কোথায় কী করছে, কিছুই জানি না। একবার মনে হল বিদ্রোহী সিপাইরা তো আমার চেনা লোক, তাদের সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক, তাদের কাছেই যাই-না কেন?

কাশী কিছুতেই রাজি হল না। বলল, 'না দাদা, এখন ওদের বিশ্বাস নেই। তাছাড়া তোমার লোহার সিন্দুকে ১২-১৪ হাজার টাকা আছে, বরং বাড়ি ফেরাই ভালো। ঘোড়াগুলোকে বাঁচানো দরকার, তেমন হলে ঘোড়ায় চড়ে পালানো যাবে।'

শেষ অবধি তাই ঠিক করলাম। যাবার আগে সহিসের সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় ভীষণ জোরে তোপের আওয়াজ হল। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গুলি চলতে লাগল—আমাদের মাথার ওপর দিয়ে, পাশ দিয়ে, চারদিক দিয়ে। চেয়ে দেখি সায়েবদের বাড়ি সব জ্বলতে আরম্ভ করেছে, চাকরবাকররা তাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সরাতে ব্যস্ত। তাদের অনেকে গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ল।

গতিক দেখে কাশীকে বললাম, 'বাড়ি গিয়ে কাজ নেই। ওখানে এতক্ষণে বিদ্রোহীরা হয়তো আগুন লাগিয়ে লুটপাট করছে। বরং সেনা-নিবাসেই যাওয়া যাক, কিছু খবরও পাওয়া যাবে।'

সায়েবের আপিসের জানলার কাচ ভেঙে কাগজপত্রগুলো ভেতরে ফেলে দিলাম, তারপর দু'-ভাই রওনা হলাম।

রওনা তো হলাম, কিন্তু যেরকম এলোপাতাড়ি গুলি চলছে, যাওয়াই মুশকিল। সুবিধের মধ্যে গুলি-ছোঁড়ার কোনও শৃঙ্খলা নেই, বেশিরভাগই ঠিক জায়গায় লাগছে না। কাজেই

www.boiRboi.blogspot.com

তারই মধ্যে সাবধানে আমরা সেনানিবাসের দিকে এগোতে লাগলাম। সেখানে পৌঁছে দেখি সব ভোঁ-ভাঁ, জনমানুষের সাড়াশব্দ নেই!

দৈবাৎ একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হল। তার কাছে শুনলাম শহরের সব ইংরেজ আর অশ্বারোহীর দল কাছেই একটা আমবাগানে জড়ো হয়েছে। কিন্তু কাশীর সেখানে যেতে প্রবল আপত্তি। অগত্যা বাড়িমুখোই রওনা হলাম। পথে দেখি তোপখানার প্রধান ইংরেজ সেনাপতির মৃতদেহ পড়ে আছে। কয়েকজন অশ্বারোহীকেও আমবাগান থেকে ফিরতে দেখলাম। একজন সহিসের মুখে শুনলাম যে অশ্বারোহীরা সায়েবদের পক্ষ নেবার জন্যই আমবাগানে গিয়েছিল, কিন্তু সায়েবরা তাদের শত্রু মনে করে ঘোড়া হাঁকিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেছেন। মেজর মহম্মদ সফি ঘোড়সোয়ার নিয়ে তাঁদের ভুল ভাঙাবার জন্য এক ক্রোশ পথ তাঁদের পেছন পেছন গেলেন, মিত্রতাসূচক লাল রুমাল ওড়ালেন, তাঁরা ফিরেও দেখলেন না। তখন মহম্মদ সফি সদলবলে ফিরে এলেন।

এদিকে পদাতিক আর তোপখানার সৈনিকরা নিজেদের থাকবার ঘরে নিজেরা আগুন দিয়ে প্যারেড গ্রাউন্ডে জটলা করছে! ব্যাপার দেখে আমি হাঁ! এরা কি পাগল হয়ে গেছে? দূর থেকে মনে হল আমাদের বাড়িতেও আগুন জ্বলছে। সেদিকে যে-কাণ্ড চলেছে, যাবার

boirboi.blogspot.com

উপায় নেই। তখন বিষণ্ণমনে আবার বীচারসায়েবের বাড়িতে ফিরে দেখি বাড়িতে আগুন লাগেনি বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে সহিস বেচারাকে কে গুলি করে মেরে ফেলেছে।

একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভাবছি কী করা যায়, হঠাৎ দেখি আমার ভবানী সহিস একটা ঘোড়া নিয়ে আসছে। সে আমাদের দেখতে পায়নি। ঠিক সেই সময় জনা ৩০ সিপাই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সেখানে দিয়ে গেল। ওরা আর মানুষের মতো নেই! নাচছে, গাইছে, গালাগাল দিচ্ছে, ধাক্কাধাক্কি করছে! কারও হাতে খোলা তলোয়ার কিম্বা ছোরা, কেউ নিয়েছে বন্দুক। কেউ আগুন জ্বালাবার মশাল, কেউ বর্শা। ওরা বিকটভাবে হাসছে, চ্যাঁচাচ্ছে, দাঁত কিড়িমিড়ি করছে! মনে হচ্ছে যেন একদল রাক্ষস।

ভবানীর কাছে ঘোড়া দেখে তারা ছুটে গেল, ভবানীও ঘোড়া ছাড়বে না। কাশী আমাকে কিছুতেই তার সাহায্যে যেতে দিল না। অতজন লোকের সঙ্গে একা পারবে কেন? শেষটা ভবানীকে বেদম পিটে, রাস্তার ধারে ফেলে, ঘোড়া নিয়ে তারা চলে গেল। আমরাও

ভবানীর কাছে ছুটে গেলাম। তখন ভবানী রক্তাক্ত শরীরে উঠে দাঁড়াল। তার কাছে শুনলাম সিপাইদের আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেখেই সে এই ঘোড়াটা নিয়ে পালিয়েছে, রামদীনকে বলে এসেছে ভালো বর্মার ঘোড়াটাকে বাঁচাতে, তারপর কী হয়েছে সে জানে না। দেখতে দেখতে রামদীনও এসে উপস্থিত। সে বলল সিন্দুক ভেঙে সিপাইরা সব টাকাকড়ি আর ঘরের আসবাব নিয়ে গেছে। একটা ঘোড়াও ছাড়েনি। বর্মার ঘোড়াটা নাকি পদাতিক সিপাইরা নিয়ে গেছে। সটাং তাদের সেনানিবাসে গিয়ে দেখলাম, কেউ কোথাও নেই।

সবই গেল, এখন দু'জনের প্রাণটুকু বাঁচাতে হবে। সেনানিবাস থেকে এক মাইল দূরে ধোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির। ওখানে আমার বেশ খাতির ছিল—প্রায়ই যেতাম—খাবার মিষ্টি বিলোতাম, পুজো করতাম, পাণ্ডাঠাকুরকে পয়সাকড়ি দিতাম। কাশীকে বুঝিয়ে রাজি করিয়ে সেইদিকে চললাম। সোজাপথে না-গিয়ে, নিরাপত্তার জন্যে অপথ কুপথ দিয়েই চললাম। জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝাঁ-ঝাঁ রোদ, আমরা দু'-ভাই পুড়ে প্রায় কাঠ! কাশীর এদিকে জল তেষ্টায় প্রাণ যায়, অথচ সেই খোলা মাঠে জলই-বা কোথায় পাই, আর কুয়ো পেলেও জল তুলবই-বা কী করে? মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। এদিক-ওদিক জলের খোঁজ করছি, এমন সময় দেখি কাশী উঠে দাঁড়িয়ে একটা নিমগাছের ডাল ভাঙছে। সে বুঝছে এখানে জল পাওয়া যাবে না। একটানে একটা মোটা ডাল ভেঙে, সেটাকে মাথার ওপর ছাতার মতো ধরে, দুই ভাই ধোপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে পৌঁছলাম।

মন্দিরের কাছে একটা অশ্বত্থগাছের তলায় একজন সন্ন্যাসী এই দারুণ গরমেও সামনে আগুন জ্বেলে বসেছিলেন। তিনি আমাদের অনেক উপদেশ দিয়ে, তাঁর কমণ্ডলু থেকে ঠাণ্ডা মিষ্টি জল খাইয়ে, দু'জনের প্রাণ শীতল করলেন। এমন ভালো জল আমরা জীবনে খাইনি।

মন্দিরের পাণ্ডা আমাদের আশ্রয় দিলেন। বসবার জন্যে চাদর পেতে দিলেন, তামাক দিলেন, বাতাসার সঙ্গে জল খেতে দিলেন। কাশী তখুনি ঘুমিয়ে পড়ল। আমি কাছে উঠে আম পাড়বার চেষ্টা করতে লাগলাম। গাছের ওপর থেকে দেখি পাঁচজন অশ্বারোহী ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে আসছে। দেখে আমার চক্ষু স্থির! পাণ্ডা বললেন—কাছেই হিন্দুদের গ্রাম আছে, সেখানে পালাতে। আমি ভাবলাম, আমাদেরই রেশালার সোয়ার, কোন দুঃখে পালাব?

কাশীকে বললাম, 'তুমি চুপ করে বসে থাকো।'

এক দৌড়ে এগিয়ে গেলাম, কাশী ক্যাঁওম্যাও করতে লাগল। আমি এগিয়ে গিয়ে আড়াল থেকে দেখি—একজন দফাদার আর চারজন সোয়ার এসেছে, সকলেই আমার চেনা।

ওরা সন্ন্যাসীকে দেখে তাঁর ওপর তম্বি করতে আরম্ভ করেছে, 'আমাদের রেশালার বাবুকে দেখেছ? হাসছ কেন, ঠিক করে বলো। নইলে কেটে ফেলব!'

তখন আমি আর থাকতে না-পেরে ওদের ডেকে হিন্দিতে বললাম, 'আমি এখানেই আছি। কাটতে হয় তো আমার মাথাটাই মজুত আছে!'

দফাদার সেলাম করে ঘোড়া থেকে নেবে বলল, 'এ কী বলছেন বাবু! এই আমার তলোয়ার আপনার পায়ের কাছে রাখলাম। ইচ্ছে হলে আমার মাথাই নেবেন।'

শুনে খুশি হলাম।

মন্দিরের পুকুরের ধারে বসে তাকে জিজ্ঞেস করলাম—কেন আমাকে খোঁজা হচ্ছে। শুনলাম—তোপখানার মেজর বখত খাঁ এখন প্রধান সেনাপতি হয়েছেন, আমাদের রেজিমেন্টের

www.boiRboi.blogspot.com

মেজর মহম্মদ সফি তাঁর অধীনে। দশ লক্ষ টাকা মজুত হয়েছে, রোজ আরও আসছে, খরচও হচ্ছে। অথচ হিসেব রাখবার একজন বিশ্বাসী লোক নেই। তাই বখত খাঁ আমাকে তলব করেছেন!

আমি বললাম যে আমার ইংরিজিতে হিসেব রাখার অভ্যেস, কাজেই এ-কাজ আমাকে দিয়ে হবে না। কিন্তু দফাদারের কথায় বুঝলাম যে আমাকে ধরে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে, আমাকে ছেড়ে দেবার সাহসই নেই তার। আরও শুনলাম—আমার ঘরবাড়ি লুট হয়েছে বলে মহম্মদ সফি ভারী দুঃখিত, আমার বর্মরি ঘোড়াটা বখত খাঁর আস্তাবলে আছে, চাইলে নিশ্চয়ই পাব। আমাদের কোনও ভয় নেই বলে দফাদার আশ্বাস দিল। বলা বাহুল্য, শেষ অবধি আমরা দুই ভাই ওদের সঙ্গে বেরিলি ফিরে গেলাম।

আমার অনুরোধে প্রথমে আমরা রেশালাদার মেজর মহম্মদ সফির সঙ্গে দেখা করলাম। তাকে বললাম বখত খাঁ বড় দাম্ভিক লোক, তাঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু বুঝলাম দেখা না-করে উপায় নেই। মহম্মদ সফি অবিশ্যি অনেক অভয়ও দিলেন, বললেন —তাঁর প্রাণ থাকতে আমাদের কোনও অনিষ্ঠ হবে না। গেলাম শেষপর্যন্ত বখত খাঁর কাছে। ৬৫ বছর বয়েস, শক্তিশালী চেহারা, আধপাকা চুল, লম্বা দাড়ি, উজ্জ্বল চোখ, সোনার কাজ-করা লাল পোশাক পরনে, আর চোখে-মুখে দুষ্টু লোকের ছাপ। বখত খাঁ আমাকে হিসেব রাখার কাজের জন্যে মাসে এক হাজার টাকা মাইনে দিতে চাইলেন, পরে তার দ্বিগুণ পাব, তাছাড়া আরও অনেক সুবিধা করে দেওয়া হবে বললেন। তবু যখন নানান মিথ্যে অজুহাতে চাকরি নিতে রাজি হলাম না, তখন দু'-চোখ লাল করে আমাদের দুই ভাইকে গারদে পুরে রাখবার হুকুম দিলেন।

হুকুম দিয়ে বখত খাঁ দরবার ভেঙে উঠে পড়লেন! মহম্মদ সফি তাঁর পেছন পেছন গেলেন। ফলে গারদের হুকুম রদ হল। মহম্মদ সফি আমাদের আপাতত জহুরিমল শেঠের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করলেন।

এই ভদ্রলোকের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। প্রত্যেক রেজিমেন্টের মধ্যে টাকা ধার দেবার ব্যবস্থার জন্যে একজন করে শেঠ থাকত প্রধান সেনাপতির অনুমতি নিয়ে। বেরিলির ক্যাম্পে হীরানন্দ শেঠের দু'লক্ষ টাকার লেনদেন ছিল, তাঁর ছেলে জহুরিমল কারবার চালাত।

জহুরিমলের বাড়ি লুট হয়নি, আগুনেও পোড়েনি, কিন্তু তার চারদিকে প্রায় ১০০ বন্দুকধারী সিপাই, বাইরে যাবার জো নেই। নিজের চাকরবাকর নিয়ে নিজের বাড়িতে থাকেন বটে, কিন্তু একটু খাবার জিনিস কিনতে দোকানে যাবারও অধিকার নেই।

এই বাড়িতে আমাদের রাখা হল। মহম্মদ সফি যাবার আগে বলে গেলেন যে শিগগিরি আমাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করবেন।

রোজ আমাদের জন্যে আটা, ঘি, তরকারি আসে বটে, কিন্তু তার সময়ের ঠিক নেই। শহরে দারুণ অব্যবস্থা, মারামারি, লুটপাট। থেকে থেকে 'ওই ইংরেজ সৈন্য এলো' বলে সবাই ভয়ে ছোটাছুটি করে, পরে দেখা যায় কিছুই নয়। হয় নিজেদের লোক, নয়তো দু'-চারটে উট কি ঘোড়া ছুটে গেছে।

দফাদারের কাছে শুনলাম তিন-চার দিন বাদে বখত খাঁ দিল্লি যাবেন এবং আমাদের বন্দি করে সঙ্গে নেবেন।

www.boiRboi.blogspot.com

রোজ ঘি আটাও কপালে জোটে না, কখনও হয়তো শুধুই ছাতু লঙ্কা আনে। শুনলাম খাঁ বাহাদুর খাঁ নাকি নবাব হয়েছেন। এ-ক'দিন ধরে সমানে ইংরেজ-হত্যা চলেছে, কেউ তাঁদের আশ্রয় দিলে তারাও বিপদে পড়ছে। মাঝে মাঝে আমাকে চাকরি নিতে বলা হয়েছিল, আমি রাজি হইনি। দিন-রাত খালি ভাবি—এখান থেকে কী করে পালানো যায়।

এরমধ্যে মহম্মদ সফির চেষ্টায় সশস্ত্র প্রহরী নিয়ে আমরা দুই ভাই শহরে গিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়ি দুপুরে খেয়ে আসবার অনুমতি ও ছাড়পত্র পেয়ে গেলাম। দুপুরে আমাদের সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে পাহারা আর দুটো তেজি ঘোড়া এলো। বেরিয়ে দেখি শহর তো নয়, শ্মশান! আধপোড়া ঘরবাড়ি, পথেঘাটে মরা মানুষ, জানোয়ার পড়ে। শকুনের পাল এসেছে, দোকান লুট হয়েছে। কত ভালো ভালো খাবার-জিনিস পথে গড়াগড়ি যাচ্ছে!

হরগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আমাদের দাদামশাই হতেন। বিদ্রোহীদের ভয়ে দরজা এঁটে বসে আছেন, অনেক ডাকাডাকির পর দরজা খোলানো গেল। সব কথা শুনে তাঁরা তাজ্জব বনে গেলেন! খাওয়াদাওয়ার পর ওঁদের কাছ থেকে সাতটা টাকা নিয়ে আমাদের প্রহরীদের উপহার দিলাম।

খেয়েদেয়ে ফিরবার পথে আর-এক কাণ্ড। দেখি কী কয়েকজন গুণ্ডা পান্না নামে একজন নামকরা নর্তকীর বাড়ি আক্রমণ করেছে। বাড়ির মধ্যে পান্না, তার দাদা, বৌদি এবং আরও কারা ছিলেন, তাঁর ভয়ে আর্তনাদ করছেন শুনতে পেলাম। আমার রক্ত গরম হয়ে উঠল, রক্ষীদের কাছ থেকে একটা বর্শা নিয়ে তেড়ে গেলাম।

এত লোকজন দেখে গুণ্ডারা ঘাবড়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, 'এঁরা মেম লুকিয়ে রেখেছিল শুনেছিলাম।'

আমরা তখন তিন ধমক দিয়ে, মুগুর, লাঠি, তলোয়ার কেড়ে নিয়ে, তাদের দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলাম যে এমন কাজ আর কখনও করবে না। সেদিন থেকে পান্না ও তার বাড়ির সকলে আমার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে রইল।

এদিকে বিদ্রোহ আরম্ভ হবার পর পাঁচদিন কেটে গেছে, তবু আমাদের বন্দিদশা ঘুচল না। মনে মনে ঠিক করেই ফেলেছি সুযোগ পেলেই কাশীকে নিয়ে পালাব। ভাবলাম, এ-ব্যাপারে পান্না আমাকে সাহায্য করতে পারে। পরদিন খেতে যাবার সময় তার সঙ্গে একটু গোপন পরামর্শও করে গেলাম। আমাদের জন্যে ওরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত।

বিদ্রোহীদের ব্যবস্থা ক্রমে আরও মন্দ হচ্ছে। এত অনিয়ম অশান্তি চুরি ডাকাতি যে কিছু করে উঠতে পারছে না তারা। মাঝে মাঝে বখত খাঁ নিজে সিপাইদের কাছে দেখা দেন, নবাবের নামেও টাকা তোলেন। মাঝে মাঝে 'ওই গোরারা এলো, এবার সবাইকে মেরে ফেলবে' বলে রব ওঠে। অমনি সে যে কী হুলস্থূল কাণ্ড শুরু হয়ে যায়, সে আর কী বলব। যে যেদিকে পারে দৌড়য়, প্যারেড গ্রাউন্ডে লোকের ভিড় জমে, এমনকী আমাদের বাড়ির প্রহরীরাও জায়গা ছেড়ে, ফটক ঘোলা রেখে, ব্যাপারটা কী দেখবার জন্যে এক-এক বার ঘুরে আসে।

ঠিক করলাম এইরকম একটা সুযোগে পালাতে হবে। কয়েকটা অস্ত্র, একটা রিভলভার, এইসবের ব্যবস্থায় রইলাম। এরমধ্যে একদিন নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁ বখত খাঁর সঙ্গে মোলাকাত করতে এলেন। চারদিকে রটে গেল যে সিপাইদের মধ্যে বিলি করবার জন্যে তিনি সঙ্গে করে ২০ হাজার টাকা আর এক হাজার সোনার বালা নিয়ে এসেছেন।

আর প্রহরীদের পায় কে! আমাকে তারা বলল, 'আপনারা ভেতরে যান, আমরা এক্ষুনি আসছি।' এই বলে সেনানিবাসের দিকে ছুটল।

আমিও সুযোগ বুঝে কাশীকে বললাম, 'পালাবার এমন সুবিধে আর হবে না। চল।'

সে তো ভয়েই কাদা! কোনওমতে তাকে তৈরি করে শেঠজিকে বললাম—আমরা একটু বাইরে গিয়ে কী ব্যাপার দেখে আসছি! ব্যস, আর কথাটি নেই, চুপি চুপি শেঠজির রিভলভার আর দু'-একটা অস্ত্র নিয়ে, ভগবানের নাম করে, দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম।

প্রথমেই আমরা আশ্রয় নিলাম পান্নার বাড়িতে, তার সঙ্গে এইরকমই পরামর্শ হয়েছিল। পান্নার বাড়িতে দুটো মহল, সদর ও অন্দর। বাইরের মহলটা চমৎকার করে সাজানো। এখানেই লোকজন আসে, গান-বাজনা হয়, দোতলায় রান্নাঘর খাবারঘরও আছে। অন্দরমহলটা তত ভালো নয়, সেখানে পান্নার মা, দাদা, বৌদি থাকেন। এই অন্দরমহলও দোতলা। তাছাড়াও মাটির নীচে একটা গোপন ঘর আছে। বেশ ঘরটা, চুপচাপ, ঠাণ্ডা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অন্ধকার তো বটেই, সর্বদা আলো জ্বালাতে হয়। তবে হাওয়া আসবার জন্যে একতলার দেয়ালে অনেকগুলো ফুটোর ব্যবস্থা আছে। ঘরটার ছাদ বেশ নিচু, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি না।

একটা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নেবে, সিঁড়িটা খুলে রাখতে হত। নাববার পথটা একটা তক্তা দিয়ে বন্ধ করে, তার ওপর বাক্স-প্যাঁটরা চাপিয়ে রাখলে, আর-কিছু বুঝবার জো ছিল না।

মুশকিল হল যে কাশী যদিও সেই ঘরে দিব্যি বাস করতে লাগল, আমি হাঁপিয়ে উঠি, প্রায়ই বাইরে থাকি। দরকার মনে হলে নীচে নাবি। এদিকে শেঠজির বাড়িতে খোঁজ খোঁজ পড়ে গেছে।

দফাদার শেঠজির মুখে যেই শুনল যে আমরা সেনানিবাসে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে আর ফিরিনি, তার তো মুখ চুন! বুঝতে বাকি রইল না যে আমরা পালিয়েছি। পরদিন তারও দেশে যাবার কথা, সে আর অপেক্ষা না-করে সেদিনই রওনা দিল, প্রহরীরাও কেউ কেউ পালাল।

সবাই জানত ব্যাপারটা শুনে বখত খাঁ দারুণ চটে যাবেন। হলও তাই। আমাদের পালানোর কথা শুনে বখত খাঁ রেগে আগুন হয়ে গালাগালি মারধোর শুরু করে দিলেন। মহম্মদ সফিকে যা-নয়-তাই বললেন। এদিকে দফাদারও নিখোঁজ, কাকে ধরে সাজা দেন? শহরময় আঁতিপাঁতি খোঁজ চলতে লাগল। যে আমাদের আশ্রয় দেবে, তার প্রাণদণ্ড হবে। যে ধরিয়ে দেবে, তার দশ হাজার টাকা পুরস্কার!

প্রথমে দাদামশাইয়ের বাড়িতে গিয়ে গালাগালি মারধোর করেও কর্মচারীরা আমাদের খোঁজ পেল না। তখন প্রহরী যারা বাকি ছিল, তারা ফাঁস করে দিল যে একদিন পান্নার সঙ্গে কী কথা বলেছিলাম। অমনি সেখানে সিপাইরা ছুটল। এদিকে আমি একবারও ভাবিনি—এত শিগগির এ-ভাবে আমাদের খোঁজা হবে। দূরবিন দিয়ে দূর থেকে সিপাইদের দেখতে পেয়ে, পান্না ছুটে এসে আমাদের গোপন ঘরে লুকোতে বলল! আমি তো কিছুতেই যেতে চাইলাম না, আমাদের জন্যে এঁদের ওপর অত্যাচার হবে, এ আমি সইতে পারছিলাম না! পান্না বললে, সে ওদের যেমন করে হোক ঠেকাবে, তার কোনও ভয় নেই।

শেষপর্যন্ত ঢুকলাম গিয়ে চোরাকুঠরিতে। সিপাইদের হাতে সেদিন পান্নাকে ও তার বাড়ির লোকদের যে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল, এখনও ভাবলে কষ্ট হয়। মাটির নীচের ঘর থেকেও টের পাচ্ছিলাম ওপরে খানাতল্লাসি চলেছে। ধুপধাপ শব্দে ভয় হচ্ছিল এই বুঝি ছাদ ভেঙে পড়ে। কিন্তু শেষপর্যন্ত হতাশ হয়ে তাদের ফিরতে হল। পান্নাদের সেদিন মারধোরও সইতে হয়েছিল। কিন্তু আমাদের বাঁচাতে পেরে তাদের আনন্দের সীমা ছিল না।

এর পরেও আরও কয়েকদিন সেখানে থাকতে হল। ঠিক করেছিলাম বখত খাঁ দিল্লি রওনা হয়ে গেলেই, আমরাও বেরিয়ে পড়ব।

১৪ জুন ১৮৫৭—সত্যি সত্যি তিনি রওনা হলেন, সঙ্গে গেল তাঁর সৈন্য আর ইংরেজদের যত বন্দুক, কামান, গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র ও টাকাকড়ি। খাঁ বাহাদুর খাঁ এদিকে বেরিলি অঞ্চলের নবাব হলেন। প্রজাদের ওপর অত্যাচারও সমান চলতে লাগল। সৈন্য সংগ্রহও চলতে লাগল, আশে-পাশের জমি দখল হতে লাগল। আমরা দুই ভাই হরগোবিন্দ দাদামশাইদের বাড়ি গিয়ে উঠলাম।

এদিকে ইংরেজরা সবাই নৈনিতালে। তাদের খাবার-দাবার, পয়সাকড়ি, সৈন্যসামন্ত কিছুই বেশি নেই। বন্ধু-জমিদার ও রাজা, নবাব যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সাধ্যমতো সাহায্য করতেন। বিদ্রোহীদের একটা কাজ ছিল এই সাহায্য বন্ধ করা। সুবিধে পেলেই রসদ কেড়ে নিয়ে, টাট্টুওয়ালাদের মেরে ফেলা হত। নৈনিতালে যাতে কেউ চিঠিপত্র পাঠাতে না-পারে, তারও ব্যবস্থা হল।

এমন সময় হুকুম হল বেরিলির বাঙালিরা যেন সপরিবারে শহর ছেড়ে চলে যায়। এই হুকুম পেয়েই হরদেব ও হরগোবিন্দ দাদামশাইরা আরও কয়েক ঘর বাঙালির সঙ্গে বেরিলি

www.boiRboi.blogspot.com

ছাড়লেন। কিন্তু দেশে ফেরা তখন নিরাপদ ছিল না—অনেকটা পথ, অনেক বিপদ। তাঁরা উত্তর দিকে গিয়ে কাশীপুরের রাজা শিবরাজ সিংহের কাছে আশ্রয় নিলেন।

এই সময় বেরিলির অবস্থা ভাবা যায় না! খাঁ বাহাদুর খাঁর এতই ভয় যে ইংরেজি-জানা মানুষ মাত্রকেই ভাবেন ইংরেজদের দলের লোক। মাঝে একবার তাদের কয়েদ করবার হুকুমও হল, আবার ক'দিন বাদে রদ হল। কাশী তো ভয়েই আধমরা, আমাকে বলে, 'ও দাদা, আমাদের কী হবে? আমাদের মতো ভালো ইংরিজি তো এখানে কেউ জানে না!' কিন্তু যে কারণেই হোক, আমাদের কেউ ধরে নিয়ে যেতে এলো না।

মোট কথা, বেরিলিতে আর থাকা নয়। সারাদিন ঘরে থাকি, সন্ধেবেলায় একরকম ছদ্মবেশ ধরেই বন্ধুবান্ধবের খোঁজ করি। সেই নিয়ামৎ খাঁ ছিলেন ইংরেজ ভক্ত, ওদিকে আবার খাঁ বাহাদুর খাঁর আদরের মেয়ে তাঁর পুত্রবধু। কাজেই তাঁকে কেউ-কিছু বলতে সাহস পায় না। আমাদের তিনি বরাবরই খুব স্নেহ করতেন।

এদিকে শহর ছাড়তে হলে মুক্তিপত্র লাগে, অথচ সেটা না-চাওয়াই ভালো মনে হচ্ছিল। কী জানি, আবার যদি নবাবসায়েব চাকরি নিতে বলেন। কাজেই লুকিয়ে ছদ্মবেশ ধরে পালানো ছাড়া উপায় নেই। শহরের পাহারাওলারা ধরলে, তাদের ঘুষ দিয়ে বশ করা যেতে পারে। ট্যাঁক কিন্তু গড়ের মাঠ, পান্নার কাছ থেকে ১১টা সোনার মোহর চেয়ে আনলাম।

হরদেবদাদার বাড়িতে বুড়ো রামকমল চক্রবর্তী থাকতেন। ৭৫-এর ওপর বয়েস, কোথাও যাবার তাঁর শক্তি নেই, ইংরিজিও জানেন না, কাজেই তাঁকে থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ছদ্মবেশ ধরব শুনে তিনি বললেন, 'তোমরা দু'জনে ব্যাপারি সেজে যাও। টাট্টুওলা ঠিক করে দিচ্ছি, সে শুধু ঘোড়া চালাবে। বেচাকেনা হবে তোমাদের কাজ।'

তাই ঠিক হল। ১৪ টাকা দিয়ে দুটো টাট্টুওলা ঠিক করে এক টাকা করে বায়না দেওয়া হল, পরদিন ভোরে রওনা হওয়া!

সেদিন রাত্তিরে কাশী মহা হাঁউমাউ করতে লাগল, তার পেছনে মস্ত ফোড়া, ব্যাথার চোটে সে যায় আর কী! এ তো মহা গেরো! শেষপর্যন্ত রামকমল ঠাকুরদা বললেন, 'কাশী থাক, ওকে আমি এমনি লুকিয়ে রাখব, কেউ খুঁজে পাবে না। তোমার কথা আলাদা, তুমি যাও। এ অবস্থায় কাশী হাঁটতে পারবে না, নির্ঘাৎ ধরা পড়বে।'

এই পরামর্শই ভালো মনে হল।

খুব ভোরে টাট্টুওলারা এলো, সঙ্গে নিলাম কাপড়ে-জড়িয়ে সেই রিভলভারটা, আর হাতে একটা মোটা লাঠি। তাছাড়া ট্যাঁকে-বাঁধা ১১টা মোহর আর রামকমল ঠাকুরদার দেওয়া ছোট-পুঁটলিতে আটা, ডাল আর নুন।

৩

বেরিলি শহরের বাইরে পর পর বিদ্রোহীদের তিনটে ঘাঁটি, এক-এক ঘাঁটিতে আট-দশ-টা লম্বা চালাঘর, দুটো তোপ, ৫০জন অশ্বারোহী, ১০০জন পদাতিক। টাট্টুওয়ালার পরামর্শে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে, ঘোড়ার গায়ে হাত রেখে,

www.boiRboi.blogspot.com

ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদে তিনটি ঘাঁটিই পার হয়ে গেলাম। কেউ কিছু সন্দেহও করল না। ততক্ষণে বেরিলি ছেড়ে মাইল দশেক এসেছি।

বেরোবার সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, এখন বেজায় রোদ। একটা গণ্ডগ্রামের কাছে পৌঁছলাম। আগে এখানে বেশ বড় হাট বসত, কিন্তু বখত খাঁর লোকরা লুটপাট করে বিশেষ কিছু রাখেনি। এইখানে স্নানাহার সেরে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে ১৪ মাইল দূরের চটিতে সন্ধের আগে পৌঁছতে হবে, নইলে পথে ডাকাতের হাতে পড়বার ভয়।

খেয়ে উঠে এমনি ঘুমিয়ে পড়লাম যে টাট্টুওলার ডাকে তবে ঘুম ভাঙল। তাড়াতাড়ি যেতে হবে, অথচ এত হাঁটা আমার অভ্যেস নেই। শেষে টাট্টুওলার পরামর্শে ঘোড়ার পিঠে চাপলাম। নিজেরই হাসি পেতে লাগল—বড় বড় মিলিটারি ঘোড়ায় চড়া যার অভ্যেস, আজ সে কিনা একটা হাড়জিরজিরে বেতো টাট্টুর পিঠে! ঘোড়াটার যেন দম বেরিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, যে-কোনও মুহূর্তে মড়মড় করে ভেঙে পড়বে!

যখন সন্ধে হয়ে এলো, তখন আমরা একটা বিশাল মাঠের মধ্যে। এখানেই ডাকাতের ভয়। ঘোড়া থেকে নেবে রিভলভারটা হাতে নিয়ে আগে আগে আমি চললাম, পেছন পেছন ঘোড়ার পিঠে জিনিসপত্র চাপিয়ে, লাঠি হাতে টাট্টুওলা চলেছে।

দূরে একটা বড় ইঁদারার ধারে একজন লোক। টাট্টুওলা বলল, 'ও নিশ্চয়ই ডাকাত। ইঁদারার পাশে যাত্রীদের বিশ্রাম করবার জন্যে একটা ঘর আছে। তার মধ্যে ওর দলের লোকরা লুকিয়ে আছে!'

আমরা কাছে যেতেই লোকটা বিকট চেঁচিয়ে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

আমিও তার তিনগুণ হুঙ্কার দিয়ে বললাম, 'ব্যাটা ডাকাত! তোদের গ্রেপ্তার করতেই আমরা বেরিয়েছি। ভালো চাস তো সঙ্গে চল, নয়তো পিটিয়ে হাড় গুঁড়ো করে দেব!'

টাট্টুওলা বলল, 'এই লোকটাই ডাকাতের সর্দার, ও অনেক লোক খুন করেছে!' এই বলে লাঠি উঁচিয়ে তার দিকে তেড়ে গেল। তাই দেখে লোকটাও পরিত্রাহি চ্যাঁচাতে লাগল। চিৎকার শুনে ১৬জন কালো কুচকুচে ষণ্ডা লোক লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে একসঙ্গে ছুটে এলো, যেন একটা বীভৎস কালো মেঘ!

আমার হাতে বন্দুক, এই এক মস্ত সুবিধে। আট-নয় হাত দূর থেকে পাঁচটা গুলিতে চারজনকে ধরাশায়ী করলাম। টাট্টুওলাও সমানে লাঠি চালাচ্ছে। ডাকাতরা খানিকক্ষণ খুব লড়াই করল, আমার কাঁধে প্রচণ্ড লাঠির বাড়িও পড়ল। শেষপর্যন্ত যখন ওদের ছ'জন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, বাকিরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল। কিন্তু সেই অন্ধকারে আমার এত সাধের রিভলভারটা আর খুঁজে পেলাম না, ডাকাতরাই কেউ হয়তো মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে থাকবে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে টাট্টুঘোড়াটা এতক্ষণ চুপ করে এক জায়গাতেই দাঁড়িয়েছিল, এত গোলমালেও পালায়নি!

যাই হোক, প্রাণে-যে বাঁচলাম, সেই ঢের। এখানে আর থাকলাম না, চারদিকে নাকি ডাকাতের আড্ডা। রাত সাড়ে-আটটায় চটিতে পৌঁছলাম। কুয়োর জলে শরীর থেকে রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলে, পরিষ্কার কাপড়চোপড় পরে, সারাদিনের গ্লানি খানিকটা কাটিয়ে উঠলাম। কিন্তু সে-রাত্তিরে খেতেও ইচ্ছে করল না, ভালো ঘুমও হল না। আমরা যাব কাশীপুর হয়ে নৈনিতাল। পরদিন ভোরে উঠেই রওনা হলাম। প্রায় ১২ মাইল পথ যাবার পর দেখি পথটা

দু'-ভাগ হয়ে গেছে। কাঁচা রাস্তা গেছে কাশীপুর, পাকা রাস্তা নৈনিতাল! টাট্টুওলাকে বললাম, 'কাশীপুর গিয়ে কাজ নেই, সোজা নৈনিতালই চলো।' শেষটা এক টাকা বেশি দেব বলতে সে রাজি হল।

সারাদিন খাওয়াদাওয়া নেই, রোদে পুড়ে হাঁটা, সন্ধেবেলায় সাফাখানায় পৌঁছলাম। এখানে সরকারি দাওয়াইখানা আছে, আর আছে দুটো চালাঘরে মুদির দোকান—যদিও বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। একটা চালাক-চেহারার রোগাপট্‌কা হিন্দুস্থানি যুবককেও দেখলাম। সে আমাকে দেখেই চিনল, নাকি বেরিলিতে আমার পরিচিত মিশ্র বৈদ্যনাথের বাড়িতে দেখেছে।

তার সঙ্গে আলাপ করে জানলাম—সে বৈদ্যনাথের গুপ্তচর। গোপনীয় খবর নিয়ে নৈনিতালের ইংরেজদের কাছে যাচ্ছে। সে-রাতে আটার গোলা সেঁকে খেলাম, তারপর গাছতলায় শুয়ে ঘুম। পালা করে পাহারা দেবার কথা, আমি কিন্তু একঘুমে রাত কাবার করে দিলাম। ভোরে উঠে বুঝলাম যুবকটি সারারাত জেগেছিল।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ। সঙ্গে খাবার নেই, জল নেই, বন্দুকও নেই। তার ওপর শুনলাম এই বনে বাঘ বেরোয়। হিন্দুস্থানি ছেলেটার গায়েও খুব জোর নেই, মনেও খুব সাহস নেই। টাট্টুওলা খালি এককথা বলে—দিন থাকতে থাকতে জঙ্গল পেরোতে হবে, একেবারে কালাডুঙ্গি না-পৌঁছনো অবধি খাবার কিম্বা জল কিম্বা বিশ্রাম কিছুই মিলবে না।

মাঝপথে একদল গ্রাম্য হিন্দুস্থানি ছেলে মেয়ে বুড়োকে দেখলাম—মহা কান্নাকাটি করতে করতে চলেছে। ওরা নাকি আত্মীয়স্বজনদের খোঁজে নৈনিতাল যাচ্ছিল, পাহাড়ের নীচে থেকেই ইংরেজ পাহারাওলারা তাদের মেরে তাড়িয়েছে। এরা এখন সাফাখানা যেতে চায়। ওদের তাড়াতাড়ি এগোতে বলে আমরাও পা চালালাম।

বন আরও গভীর হয়ে উঠেছে, তার ওপর ঝোড়ো হাওয়ার গর্জন। বিকেল হয়ে এসেছে, রাতের আগে জঙ্গলের এলাকা ছেড়ে না-গেলে বিপদ! এমন সময় দু'জন বলিষ্ঠ লোক ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত, তাদের নাকি বুনো হাতিতে তাড়া করেছে! এইটুকু বলেই তারা আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল, আমরাও সাবধানে এগোলাম। বুনো হাতি কোথাও দেখা গেল না।

হঠাৎ দেখি দূরে মেঘের মতো পাহাড়। টাট্টুওলা চেঁচিয়ে বলল, 'আর ভয় নেই, ওই যে কালাডুঙ্গি, ওই নৈনিতাল!'

তখন বেলা পাঁচটা। পাহাড়ি ঝরনার জল পান করে শরীর ঠাণ্ডা করলাম, একটু বিশ্রাম করলাম, তারপর আবার রওনা হলাম। কালাডুঙ্গিতে এখন-আর কিছু নেই। এর কাছেই হলদোয়ানিতে নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রধান সেনানিবাস, মাঝে মাঝে সেখান থেকে সিপাইরা এসে কালাডুঙ্গিতে যাকে পেত—মেরে-ধরে জিনিসপত্র কেড়ে নিত। এ-পথে যাতে নৈনিতালের ইংরেজদের কাছে কোনও রসদ বা সাহায্য না-পৌঁছয়, এই ছিল তাদের লক্ষ্য।

পাহাড়ে উঠবার দুটো পথ। সোজা পথ ধরলে, হেঁটে একটা পাহাড়ি নদী পার হয়ে, অল্প সময়ের মধ্যেই নৈনিতাল পৌঁছনো যায়। কিন্তু নদীতে যেমনি পাথর, তেমনি স্রোত। বাঁকা পথ দিয়ে দু'-মাইল ঘুরে, পুল পার হয়ে যেতে হয়। আমরা এই পথই ধরলাম। ক্রমে উঁচুতে উঠতে লাগলাম। অভ্যেস নেই, হাঁপ ধরতে লাগল। বাতাসও কনকনে ঠাণ্ডা মনে হল।

প্রায় দু'-মাইল উঠেছি, হঠাৎ টাট্টুওলা বলল, 'বাবু কালাডুঙ্গিতে একজন ইংরেজ থানাদার আছে, তার কাছে পাশ না-নিলে, ইংরেজ পাহারাওলারা আমাদের নৈনিতাল যেতে দেবে না। পাশের কথা ভুলে গেছি!'

আবার কালাডুঙ্গিতে ফিরে আসতে হল। এসে দেখি থানাদারের দরজা বন্ধ—কেউ কোথাও নেই, এদিকে সূর্যও ডুবল বলে!

কী করব ভাবছি, এমন সময় হৈ হৈ রৈ রৈ করে প্রায় ৫০-৬০জন ঘোড়সোয়ার তলোয়ার হাতে আমাদের দিকে তেড়ে এলো। দেখতে দেখতে ওরা আমাদের ঘিরে ফেলে বলে কিনা—আমরা নৈনিতালের ইংরেজদের জন্যে রসদ নিয়ে যাচ্ছি, আমিই নাকি দলপতি! যত বলি আমি একজন চাপরাশি—বেরিলিতে কাজ করতাম, ভাইয়ের খবর নিতে নৈনিতাল যাচ্ছি, কে কার কথা শোনে। হিন্দুস্থানি ছোকরা আবার বলে বসল, 'আমি ওঁর চাকর!'

আর পায় কে! চাপরাশির আবার চাকর! মারো, ঠ্যাং কেটে দাও, আগুনে পোড়াও ইত্যাদি নানান জল্পনা-কল্পনার পর, হলদোয়ানিতে সেনাপতি ফজল হকের কাছে নিয়ে যাওয়া স্থির হল।

তারপর নাকালের একশেষ হলাম। হাত-বেঁধে আমাকে হলদোয়ানিতে নিয়ে চলল। আমি হেঁটে, ওরা ঘোড়ায়, একটু দেরি করি তো পিঠে সপাসপ বেত পড়ে। খিদেয় তেষ্টায় প্রাণ যায়, পা আর চলে না। একজন অশ্বারোহীকে বললাম, 'যদি একটু জল খেতে দাও, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।' তার কেমন দয়া হল, পাশের ঝরনার জল খেতে অনুমতি দিল। আঃ! ধড়ে যেন আবার প্রাণ ফিরে এলো!

অন্য-একটা দলের আরও কয়েকজন টাট্টুওলাকে সিপাইরা ধরেছিল, এখন সবাইকে একসঙ্গে করে হলদোয়ানির দিকে চলল। হিন্দুস্থানি ছোকরার দেখলাম চোখে জল, আর

টাট্টুওলার নাকে মুখে রক্ত, খুব মেরেছে বোধ হল। যেতে যেতে অন্য টাট্টুওলাদের সঙ্গে যে আটা ঘি ইত্যাদি ছিল—সিপাইরা তার কিছু কিছু নিজেরা খাবে বলে সরিয়ে রাখতে লাগল। ফজল হকই-বা সব নেবে কেন?

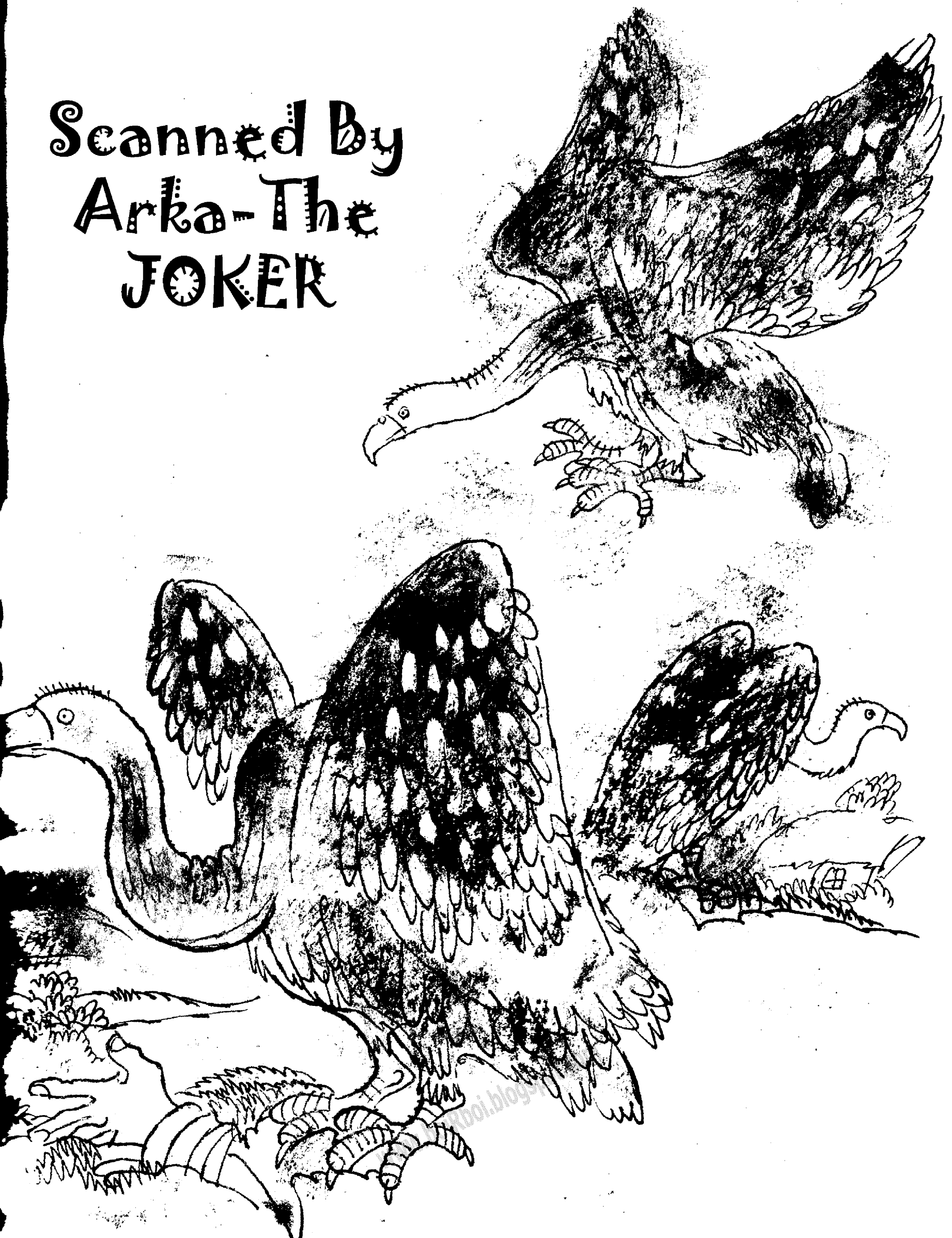

Scanned By
Arka-The
JOKER

ঘোর অন্ধকার আকাশ, ঘন জঙ্গল, পেটে দারুণ খিদে। একজনের পিছনে একজন সরু পথ দিয়ে চলেছি, হঠাৎ দেখি মাটিতে একটা বড় মুলো পড়ে আছে। তুলে নিয়েই দিয়েছি এক কামড়, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আমার মুখ গলা বুঝি জ্বলে গেল—সে কী সাংঘাতিক ঝাল মুলো! তার ওপর মাঝপথে একটা কলাবাগান থেকে সিপাইরা কাঁদি কেটে নিতে লাগল, তার একটা আবার আমার কাঁধে চাপাল। আমার অবস্থা কাহিল!

হঠাৎ সামনের দিক থেকে আমাদের ওপর গুলি বর্ষণ হতে লাগল। ব্যাপার কিছুই নয়, সঙ্কেত-ধ্বনি দিতে এরা ভুলে গেছে, নিজের ঘাঁটির লোকেরাই শত্রু ঠাউরে গুলি ছুড়ছে! কয়েকজন মরল, কয়েকজন আহত হল, তারপর ভুল বোঝা গেল, গুলি থামল!

হলদোয়ানি থেকে কিছু দূরে আমরা থামলাম, দু'জন সিপাই খবর দিতে ছুটল! এতক্ষণ অনেক কষ্টে পান্নার দেওয়া সেই ১১টা মোহর লুকিয়ে রেখেছিলাম, এবার সুযোগ পেয়ে সবার চোখের আড়ালে একটা বটগাছের তলায় সেগুলোকে থলিসুদ্দু পুঁতে রাখলাম!

হলদোয়ানিতে মৌলবি ফজল হকের বাড়িতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। বাকি সবাই নীচে রইল, শুধু আমাকে দোতলায় ফজল হকের কাছে আনা হল। লাল চোখ, ভীষণ মূর্তি, কর্কশ গলা। আমার কোনও কথা তিনি শুনলেন না, সকালে আমাকে তোপ দিয়ে উড়িয়ে দেবার হুকুম দিলেন। আপাতত সে-রাতের মতো গাছতলায় দুটো তক্তাপোষের সঙ্গে আমাকে হাতে পায়ে কোমরে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হল।

এই অঞ্চলটা এখন নবাব খাঁ বাহাদুরের অধীনে। দেশ-শাসনের জন্যে একজন গভর্নর আছেন, সকালে তাঁর সামনে নাকি আমাকে তোপে ওড়ানো হবে। সকালে খবর এলো গভর্নর সেদিন না-এসে পরেরদিন আসবেন।

তার মানে, আরও ২৪ ঘণ্টা না-খেয়ে শেকল-বাঁধা থাকতে হবে! একজন মুসলমান আমার জন্যে ছোলা, ছাতু আর জল এনেছিল। কিন্তু আমি গোঁড়া ব্রাহ্মণ, সে-সব ছুঁলাম না। পরে দয়া করে একজন হিন্দুর হাতে ওরা আমার খাবার পাঠাল। আমি হাত-মুখ ধুয়ে, সন্ধ্যাবন্দনাদি করে, খাবার মুখে দিলাম। কিন্তু শরীর এতই অবসন্ন, সে-খাবার গিলতে পারলাম না।

এইভাবে আরেকটা রাত কাটল। তারপর আরেকটা সকাল। বেলা দুটোর সময় ২৫-৩০ জন অশ্বারোহীর সঙ্গে, ঘোড়ায় চড়ে, বহুমূল্য পোশাক পরে, একজন পরম রূপবান যুবাপুরুষ এলেন। ইনিই গভর্নর, এঁরই হাতে আমার জীবন-মরণ নির্ভর করেছে। আমার শেকল খুলে দিয়ে সিপাইরা গর্জন করে উঠল, 'উঠে দাঁড়াও!'

আমি কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালাম। তখন সেই গভর্নর মধুর স্বরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবুসাহেব, আপনি এখানে কেন?'

কে ইনি, চেনা চেনা লাগছে! তিনি আমার আরও কাছে এলেন। এবার তাঁকে চিনতে পারলাম, আমার দু'-চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

নবাবসায়েব বললেন, 'বাবুসায়েব, আমাকে না-মেরে কেউ আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না।'

ইনি আর কেউ নন, আমার বেরিলির বন্ধু হাফেজ নিয়ামৎ খাঁর ছেলে, নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁর আত্মীয়, চুন্না মিঞা! আমার সৌভাগ্যের সময় এঁকে আমি কত কাপড়চোপড় টাকাকড়ি

দিয়েছিলাম, তখন এঁদের বড় দুরবস্থা ছিল। আজ ইনিই গভর্নর। আমি এঁর হাতে বন্দি। ভাগ্য কাকে বলে!

চুন্না মিঞা আমাকে অভয় দিয়ে ফজল হককে বোঝালেন—আমি খুব ভালো লোক, ওঁর বহুদিনের চেনা, আমাকে ছেড়ে দেওয়া দরকার। তারপর আমার শেকল খুলে, ঘোড়ায় চাপিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ভাগ্যের চাকা এমনি করেই ওঠে পড়ে। আমার কথায় টাট্টুওলা আর হিন্দুস্থানি যুবকটিও মুক্তি পেয়ে, আমাদের সঙ্গে এ-বাড়িতে এলো।

কতদিন পরে চান করলাম, পরিষ্কার কাপড় পরলাম, ব্রাহ্মণ-সৈনিকদের কাছ থেকে জলখাবার খেলাম। তারপর প্রচুর পরিমাণে চাল, ডাল, ঘি, আলু, মসলা, তরিতরকারি দিয়ে চমৎকার করে খিচুড়ি রাঁধলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শরীরের এমনই অবস্থা যে দু'-চার গ্রাসের বেশি খেতে পারলাম না, টাট্টুওলা কিন্তু মনের আনন্দে সব খেয়ে ফেলল। তার ফলটা অবিশ্যি খুব ভালো হয়নি।

এই সময় একজন অদ্ভুত লোক এসে আমাকে বলল, 'আপনিই কি দুর্গাদাসবাবু? নৈনিতালের ইংরেজরা গুপ্তচরের মুখে আপনার ধরা-পড়ার কথা শুনে বড়ই উদ্বিগ্ন আছেন।'

বাস্তবিক এ-লোকটিও গুপ্তচর, বিদ্রোহীদের হয়ে সে নৈনিতালের পথঘাট, ইংরেজদের ব্যবস্থাদির খবর এনে দিত। লোকটা পাহাড়ি, তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার পাহাড়েই থাকত। ধূর্ত ইংরেজরা কী করে সে-খবর পেয়ে, তাদের সবসুদ্দু আটক করে রাখল। তারপর এই শর্তে পাহাড়ি-গুপ্তচর সপরিবারে ছাড়া পেল—সে উল্টে বিদ্রোহীদের খবর নৈনিতালে এনে দেবে এবং ছলে-বলে-কৌশলে বিদ্রোহী সৈন্যকেও নৈনিতালের পথে এনে দেবে, যাতে ইংরেজরা তাদের বাগে পেয়ে আক্রমণ করতে পারে। অর্থাৎ, এখন লোকটা সত্যিই ইংরেজদের গুপ্তচর, যদিও বিদ্রোহীরা তা জানে না।

চুন্না মিঞা আমাকে যে কীরকম আদর-যত্নে রেখেছিলেন, সে ভুলবার নয়। আমার জন্যে ভালো খাওয়াদাওয়া নাচ-গানের আয়োজন করে পাঁচ-সাতদিন থেকে যেতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যাবার জন্যে এতই ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম—শেষপর্যন্ত আমাদের তিনজনের জন্যে ছাড়পত্র সই করে, ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায় দিলেন।

অনেক কষ্টে গাছ চিনে, তার তলা থেকে আমার মোহরের পুঁটলিটা বের করে নিয়ে, আমরা যাত্রা করলাম। আধ মাইলও যাইনি, আবার কয়েকজন সিপাইয়ের হাতে ধরা পড়লাম। ছাড়পত্র দেখালাম। ওরা বলল, 'এ জাল পত্র।' দড়ি দিয়ে বেঁধে মারতে মারতে আবার নিয়ে গেল চুন্না মিঞার কাছে। তাঁর তো চক্ষু স্থির! তক্ষুনি আমাদের বন্ধনদশা ঘুচল। সিপাইদের কষে মারা হল, তারপর আবার বিদায় গ্রহণ করে বেরিয়ে পড়লাম। চুন্না মিঞা আমাদের নৈনিতাল যেতে বারণ করেছিলেন, বেরিলিতে ফিরে যেতে বলেছেন। তাই আমরা সেই পথই ধরলাম।

তখন সন্ধে হয়ে এসেছে, ঘোর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, চোখে পথ দেখা যায় না। তার মধ্যে সেই হিন্দুস্থানি যুবক কখন নিঃশব্দে সরে পড়ল, টেরই পেলাম না। উপরন্তু সকালের সেই অতিরিক্ত খিচুড়ি খাওয়াটা টাট্টুওলার পেটে সয়নি। অনেক কষ্টে মাইল পাঁচেক এগিয়েছি, রাত তখন আটটা হবে, এমন সময় বনের মধ্যে একটা খসখস শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। বাঘ নয় তো?

www.boiboi.blogspot.com

বেরিয়ে এলো লাঠি-হাতে ছ'জন বিকট আকারের ডাকাত। আমিই ছিলাম সামনে, আমাকে ধমক দিয়ে বলল, 'কী আছে তোমার কাছে?'

বললাম, 'বিশেষ কিছুই না। ওই টাট্টুর পিঠে সামান্য জিনিসপত্র, টাট্টুটাও আমার নয়।' এই বলে পেছন ফিরে দেখি টাট্টু দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু টাট্টুওলার টিকির দেখা নেই!

অমনি পিঠে এক লাঠির বাড়ি পড়ল। তারপর ডাকাতরা আমার সব জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে, পয়সাকড়ি কী আছে দেখবার জন্যে আমার কাপড়চোপড় ঝাড়তে শুরু করল। আমিও কৌশল করে, অন্ধকারের সুবিধে পেয়ে, মোহরের পুঁটলিটা মাটিতে ফেলে, তার ওপর পা রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম। শেষপর্যন্ত আমার পরনের কাপড়টা ছাড়া সবকিছু নিয়ে ওরা জঙ্গলের ভেতর গা-ঢাকা দিল।

এবার আমি একেবারে একা, টাট্টুওলার সঙ্গে আর-কখনও দেখা হয়নি। অন্ধকারে ওই ঘোর জঙ্গলে দিশেহারা হয়ে শেষটা এমন এক জায়গায় পৌঁছলাম—যেখানে চারদিক কাঁটাবন, আর-এক পা-ও এগুনো যায় না। নিরুপায় হয়ে কেবলই ভগবানকে ডাকতে লাগলাম। আশেপাশে অনেক গাছ ছিল, তাদের অনেকগুলোর নিচু থেকে ডালপালা বেরিয়েছে, সহজেই ওঠা যায়। ভাবছিলাম গাছে উঠেই কি রাতটা কাটিয়ে দেব? যদি পড়ে যাই, যদি ভল্লুক কিম্বা কোনও হিংস্র জন্তু সেই গাছে ওঠে! এমন সময় একটা বিকট গর্জন শুনে, সামনের গাছটায় একেবারে মগ-ডালে উঠে পড়লাম। সেখানে পিঠে ঠেস দেবার মতো আর-একটা ডালও পেলাম। নিজের কাপড় দিয়ে গাছের ডালের সঙ্গে শরীরটা শক্ত করে বেঁধে, রাত কাটাবার জন্যে তৈরি হলাম।

সে-রাতের কথা আমার চিরকালের মতো মনে থাকবে। কখনও জোরে বাতাস দেয়, ডাল দোলে, আমি ভাবি এই বুঝি পড়লাম! ঘুম আসে, একদিকে ঝুঁকে পড়ি, আবার চমকে সোজা হয়ে বসি। ঘুম তাড়াবার আশায় মগ-ডাল থেকে মাঝখানের ডালে, সেখান থেকে নীচের ডালে ওঠা-নামা করতে লাগলাম। নিজের দুঃখে বুক ফেটে যেতে লাগল। কিন্তু একসময় সেই দুঃখের রাতেরও শেষ হল। আমি গাছ থেকে নেবে, গাছের ডালে পাথর দিয়ে নিজের নাম লিখে, গাছের গোড়ায় জুতো জোড়া ত্যাগ করলাম। তারপর গাছের একটা সরু ডাল ভেঙে লাঠি তৈরি করে, হালকা শরীরে রওনা হলাম। যেদিকে কম গাছ দেখলাম, সেইদিকে চললাম। কিছুদুর যেতেই একটা পাহাড়ি নদী পেলাম, তার ভীষণ স্রোত। নদীর ধার দিয়ে এগোতে লাগলাম, পা কেটে রক্ত পড়তে লাগল। যেদিকে চোখ যায় চলেছি, মস্ত একটা খোলা জায়গায় পড়লাম, সেখানে বড় বড় শিংওলা হরিণের দল চরছে। তারপর ফাঁকা ফাঁকা জঙ্গল, তারপর একটা বড় নদী। বেলা গড়িয়ে গেছে, খিদেয় পেট জ্বলছে।

গাছে নানা ফল দেখলাম। কিন্তু কোনটা ভালো আর কোনটা বিষফল, তাও জানি না—খাই কোন সাহসে? তারপর একটা লতাগাছ চোখে পড়ল। নৈনিতালের দিকে যাবার সময় হলদোয়ানিতে মৌলবি ফজল হকের বাড়িতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। বাকি সবাই নীচে রইল, শুধু আমাকে দোতলায় ফজল হকের কাছে আনা হল। লাল চোখ, ভীষণ মূর্তি, কর্কশ গলা। আমার কোনও কথা তিনি শুনলেন না, সকালে আমাকে তোপ দিয়ে উড়িয়ে দেবার হুকুম দিলেন। আপাতত সে-রাতের মতো গাছতলায় দুটো তক্তাপোষের সঙ্গে আমাকে হাতে পায়ে কোমরে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হল।

এই অঞ্চলটা এখন নবাব খাঁ বাহাদুরের অধীনে। দেশ-শাসনের জন্যে একজন গভর্নর আছেন, সকালে তাঁর সামনে নাকি আমাকে তোপে ওড়ানো হবে। সকালে খবর এলো গভর্নর সেদিন না-এসে পরেরদিন আসবেন। তার মানে, আরও ২৪ ঘণ্টা না-খেয়ে শেকল-বাঁধা থাকতে হবে! একজন মুসলমান আমার জন্যে ছোলা, ছাতু আর জল এনেছিল। কিন্তু আমি গোঁড়া ব্রাহ্মণ, সে-সব ছুঁলাম না। পরে দয়া করে একজন হিন্দুর হাতে ওরা আমার খাবার পাঠাল। আমি হাত-মুখ ধুয়ে, সন্ধ্যাবন্দনাদি করে, খাবার মুখে দিলাম। কিন্তু শরীর এতই অবসন্ন, সে-খাবার গিলতে পারলাম না।

এইভাবে আরেকটা রাত কাটল। তারপর আরেকটা সকাল। বেলা দুটোর সময় ২৫-৩০ জন অশ্বারোহীর সঙ্গে, ঘোড়ায় চড়ে, বহুমূল্য পোশাক পরে, একজন পরম রূপবান যুবাপুরুষ এলেন। ইনিই গভর্নর, এঁরই হাতে আমার জীবন-মরণ নির্ভর করেছে। আমার শেকল খুলে দিয়ে সিপাইরা গর্জন করে উঠল 'উঠে দাঁড়াও!'

আমি কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালাম। তখন সেই গভর্নর মধুর স্বরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবুসাহেব, আপনি এখানে কেন?'

কে ইনি, চেনা চেনা লাগছে! তিনি আমার আরও কাছে এলেন। এবার তাঁকে চিনতে পারলাম, আমার দু'-চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

নবাবসায়েব বললেন, 'বাবুসায়েব, আমাকে না-মেরে কেউ আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না।'

ইনি আর কেউ নন, আমার বেরিলির বন্ধু হাফেজ নিয়ামৎ খাঁর ছেলে, নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁর আত্মীয়, চুন্না মিঞা! আমার সৌভাগ্যের সময় এঁকে আমি কত কাপড়চোপড় টাকাকড়ি দিয়েছিলাম, তখন এঁদের বড় দুরবস্থা ছিল। আজ ইনিই গভর্নর। আমি এঁর হাতে বন্দি। ভাগ্য কাকে বলে!

চুন্না মিঞা আমাকে অভয় দিয়ে ফজল হককে বোঝালেন—আমি খুব ভালো লোক, ওঁর বহুদিনের চেনা, আমাকে ছেড়ে দেওয়া দরকার। তারপর আমার শেকল খুলে, ঘোড়ায় চাপিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ভাগ্যের চাকা এমনি করেই ওঠে পড়ে। আমার কথায় টাট্টুওলা আর হিন্দুস্থানি যুবকটিও মুক্তি পেয়ে, আমাদের সঙ্গে এ-বাড়িতে এলো।

কতদিন পরে চান করলাম, পরিষ্কার কাপড় পরলাম, ব্রাহ্মণ-সৈনিকদের কাছ থেকে জলখাবার খেলাম। তারপর প্রচুর পরিমাণে চাল, ডাল, ঘি, আলু, মসলা, তরিতরকারি দিয়ে চমৎকার করে খিচুড়ি রাঁধলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শরীরের এমনই অবস্থা যে দু'-চার গ্রাসের বেশি খেতে পারলাম না, টাট্টুওলা কিন্তু মনের আনন্দে সব খেয়ে ফেলল। তার ফলটা অবিশ্যি খুব ভালো হয়নি।

এই সময় একজন অদ্ভুত লোক এসে আমাকে বলল, 'আপনিই কি দুর্গাদাসবাবু? নৈনিতালের ইংরেজরা গুপ্তচরের মুখে আপনার ধরা-পড়ার কথা শুনে বড়ই উদ্বিগ্ন আছেন।'

বাস্তবিক এ-লোকটিও গুপ্তচর, বিদ্রোহীদের হয়ে সে নৈনিতালের পথঘাট, ইংরেজদের ব্যবস্থাদির খবর এনে দিত। লোকটা পাহাড়ি, তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার পাহাড়েই থাকত। ধূর্ত ইংরেজরা কী করে সে-খবর পেয়ে, তাদের সবসুদ্দু আটক করে রাখল। তারপর এই শর্তে পাহাড়ি-গুপ্তচর সপরিবারে ছাড়া পেল—সে উল্টে বিদ্রোহীদের খবর নৈনিতালে এনে দেবে

এবং ছলে-বলে-কৌশলে বিদ্রোহী সৈন্যকেও নৈনিতালের পথে এনে দেবে, যাতে ইংরেজরা তাদের বাগে পেয়ে আক্রমণ করতে পারে। অর্থাৎ, এখন লোকটা সত্যিই ইংরেজদের গুপ্তচর, যদিও বিদ্রোহীরা তা জানে না।

চুন্না মিঞা আমাকে যে কীরকম আদর-যত্নে রেখেছিলেন, সে ভুলবার নয়। আমার জন্যে ভালো খাওয়াদাওয়া নাচ-গানের আয়োজন করে পাঁচ-সাতদিন থেকে যেতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যাবার জন্যে এতই ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম—শেষপর্যন্ত আমাদের তিনজনের জন্যে ছাড়পত্র সই করে, ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায় দিলেন।

অনেক কষ্টে গাছ চিনে, তার তলা থেকে আমার মোহরের পুঁটলিটা বের করে নিয়ে, আমরা যাত্রা করলাম। আধ মাইলও যাইনি, আবার কয়েকজন সিপাইয়ের হাতে ধরা পড়লাম। ছাড়পত্র দেখালাম। ওরা বলল, 'এ জাল পত্র।' দড়ি দিয়ে বেঁধে মারতে মারতে আবার নিয়ে গেল চুন্না মিঞার কাছে। তাঁর তো চক্ষু স্থির! তক্ষুনি আমাদের বন্ধনদশা ঘুচল। সিপাইদের কষে মারা হল, তারপর আবার বিদায় গ্রহণ করে বেরিয়ে পড়লাম। চুন্না মিঞা আমাদের নৈনিতাল যেতে বারণ করেছিলেন, বেরিলিতে ফিরে যেতে বলেছেন। তাই আমরা সেই পথই ধরলাম।

তখন সন্ধে হয়ে এসেছে, ঘোর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, চোখে পথ দেখা যায় না। তার মধ্যে সেই হিন্দুস্থানি যুবক কখন নিঃশব্দে সরে পড়ল, টেরই পেলাম না। উপরন্তু সকালের সেই অতিরিক্ত খিচুড়ি খাওয়াটা টাট্টুওলার পেটে সয়নি। অনেক কষ্টে মাইল পাঁচেক এগিয়েছি, রাত তখন আটটা হবে, এমন সময় বনের মধ্যে একটা খসখস শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। বাঘ নয় তো?

বেরিয়ে এলো লাঠি-হাতে ছ'জন বিকট আকারের ডাকাত। আমিই ছিলাম সামনে, আমাকে ধমক দিয়ে বলল, 'কী আছে তোমার কাছে?'

বললাম, 'বিশেষ কিছুই না। ওই টাট্টুর পিঠে সামান্য জিনিসপত্র, টাট্টুটাও আমার নয়।' এই বলে পেছন ফিরে দেখি টাট্টু দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু টাট্টুওলার টিকির দেখা নেই!

অমনি পিঠে এক লাঠির বাড়ি পড়ল। তারপর ডাকাতরা আমার সব জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে, পয়সাকড়ি কী আছে দেখবার জন্যে আমার কাপড়চোপড় ঝাড়তে শুরু করল। আমিও কৌশল করে, অন্ধকারের সুবিধে পেয়ে, মোহরের পুঁটলিটা মাটিতে ফেলে, তার ওপর পা রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম। শেষপর্যন্ত আমার পরনের কাপড়টা ছাড়া সবকিছু নিয়ে ওরা জঙ্গলের ভেতর গা-ঢাকা দিল।

এবার আমি একেবারে একা, টাট্টুওলার সঙ্গে আর-কখনও দেখা হয়নি। অন্ধকারে ওই ঘোর জঙ্গলে দিশেহারা হয়ে শেষটা এমন এক জায়গায় পৌঁছলাম—যেখানে চারদিক কাঁটাবন, আর-এক পা-ও এগুনো যায় না। নিরুপায় হয়ে কেবলই ভগবানকে ডাকতে লাগলাম। আশেপাশে অনেক গাছ ছিল, তাদের অনেকগুলোর নিচু থেকে ডালপালা বেরিয়েছে, সহজেই ওঠা যায়। ভাবছিলাম গাছে উঠেই কি রাতটা কাটিয়ে দেব? যদি পড়ে যাই, যদি ভাল্লুক কিম্বা কোনও হিংস্র জন্তু সেই গাছে ওঠে! এমন সময় একটা বিকট গর্জন শুনে, সামনের গাছটায় একেবারে মগ-ডালে উঠে পড়লাম। সেখানে পিঠে ঠেস দেবার মতো

আর-একটা ডালও পেলাম। নিজের কাপড় দিয়ে গাছের ডালের সঙ্গে শরীরটা শক্ত করে বেঁধে, রাত কাটাবার জন্যে তৈরি হলাম।

সে-রাতের কথা আমার চিরকালের মতো মনে থাকবে। কখনও জোরে বাতাস দেয়, ডাল দোলে, আমি ভাবি এই বুঝি পড়লাম! ঘুম আসে, একদিকে ঝুঁকে পড়ি, আবার চমকে সোজা হয়ে বসি। ঘুম তাড়াবার আশায় মগ-ডাল থেকে মাঝখানের ডালে, সেখান থেকে নীচের ডালে ওঠা-নামা করতে লাগলাম। নিজের দুঃখে বুক ফেটে যেতে লাগল। কিন্তু একসময় সেই দুঃখের রাতেরও শেষ হল। আমি গাছ থেকে নেবে, গাছের ডালে পাথর দিয়ে নিজের নাম লিখে, গাছের গোড়ায় জুতো জোড়া ত্যাগ করলাম। তারপর গাছের একটা সরু ডাল ভেঙে লাঠি তৈরি করে, হালকা শরীরে রওনা হলাম। যেদিকে কম গাছ দেখলাম, সেইদিকে চললাম। কিছুদুর যেতেই একটা পাহাড়ি নদী পেলাম, তার ভীষণ স্রোত। নদীর ধার দিয়ে এগোতে লাগলাম, পা কেটে রক্ত পড়তে লাগল। যেদিকে চোখ যায় চলেছি, মস্ত একটা খোলা জায়গায় পড়লাম, সেখানে বড় বড় শিংওলা হরিণের দল চরছে। তারপর ফাঁকা ফাঁকা জঙ্গল, তারপর একটা বড় নদী। বেলা গড়িয়ে গেছে, খিদেয় পেট জ্বলছে।

গাছে নানা ফল দেখলাম। কিন্তু কোনটা ভালো আর কোনটা বিষফল, তাও জানি না—খাই কোন সাহসে? তারপর একটা লতাগাছ চোখে পড়ল। নৈনিতালের দিকে যাবার সময় ভালো খাওয়াদাওয়া নাচ-গানের আয়োজন করে পাঁচ-সাতদিন থেকে যেতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যাবার জন্যে এতই ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম—শেষপর্যন্ত আমাদের তিনজনের জন্যে ছাড়পত্র সই করে, ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায় দিলেন।

অনেক কষ্টে গাছ চিনে, তার তলা থেকে আমার মোহরের পুঁটলিটা বের করে নিয়ে, আমরা যাত্রা করলাম। আধ মাইলও যাইনি, আবার কয়েকজন সিপাইয়ের হাতে ধরা পড়লাম। ছাড়পত্র দেখালাম। ওরা বলল, 'এ জাল পত্র।' দড়ি দিয়ে বেঁধে মারতে মারতে আবার নিয়ে গেল চুন্না মিঞার কাছে। তাঁর তো চক্ষু স্থির! তক্ষুনি আমাদের বন্ধনদশা ঘুচল। সিপাইদের কষে মারা হল, তারপর আবার বিদায় গ্রহণ করে বেরিয়ে পড়লাম। চুন্না মিঞা আমাদের নৈনিতাল যেতে বারণ করেছিলেন, বেরিলিতে ফিরে যেতে বলেছেন। তাই আমরা সেই পথই ধরলাম।

তখন সন্ধে হয়ে এসেছে, ঘোর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, চোখে পথ দেখা যায় না। তার মধ্যে সেই হিন্দুস্থানি যুবক কখন নিঃশব্দে সরে পড়ল, টেরই পেলাম না। উপরন্তু সকালের সেই অতিরিক্ত খিচুড়ি খাওয়াটা টাট্টুওলার পেটে সয়নি। অনেক কষ্টে মাইল পাঁচেক এগিয়েছি, রাত তখন আটটা হবে, এমন সময় বনের মধ্যে একটা খসখস শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। বাঘ নয় তো?

বেরিয়ে এলো লাঠি-হাতে ছ'জন বিকট আকারের ডাকাত। আমিই ছিলাম সামনে, আমাকে ধমক দিয়ে বলল, 'কী আছে তোমার কাছে?'

বললাম, 'বিশেষ কিছুই না। ওই টাট্টুর পিঠে সামান্য জিনিসপত্র, টাট্টুটাও আমার নয়।' এই বলে পেছন ফিরে দেখি টাট্টু দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু টাট্টুওলার টিকির দেখা নেই!

অমনি পিঠে এক লাঠির বাড়ি পড়ল। তারপর ডাকাতরা আমার সব জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে, পয়সাকড়ি কী আছে দেখবার জন্যে আমার কাপড়চোপড় ঝাড়তে শুরু করল। আমিও

কৌশল করে, অন্ধকারের সুবিধে পেয়ে, মোহরের পুঁটলিটা মাটিতে ফেলে, তার ওপর পা রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম। শেষপর্যন্ত আমার পরনের কাপড়টা ছাড়া সবকিছু নিয়ে ওরা জঙ্গলের ভেতর গা-ঢাকা দিল।

এবার আমি একেবারে একা, টাট্টুওলার সঙ্গে আর-কখনও দেখা হয়নি। অন্ধকারে ওই ঘোর জঙ্গলে দিশেহারা হয়ে শেষটা এমন এক জায়গায় পৌঁছলাম—যেখানে চারদিক কাঁটাবন, আর-এক পা-ও এগুনো যায় না। নিরুপায় হয়ে কেবলই ভগবানকে ডাকতে লাগলাম। আশেপাশে অনেক গাছ ছিল, তাদের অনেকগুলোর নিচু থেকে ডালপালা বেরিয়েছে, সহজেই ওঠা যায়। ভাবছিলাম গাছে উঠেই কি রাতটা কাটিয়ে দেব? যদি পড়ে যাই, যদি ভাল্লুক কিম্বা কোনও হিংস্র জন্তু সেই গাছে ওঠে! এমন সময় একটা বিকট গর্জন শুনে, সামনের গাছটায় একেবারে মগ-ডালে উঠে পড়লাম। সেখানে পিঠে ঠেস দেবার মতো আর-একটা ডালও পেলাম। নিজের কাপড় দিয়ে গাছের ডালের সঙ্গে শরীরটা শক্ত করে বেঁধে, রাত কাটাবার জন্যে তৈরি হলাম।

সে-রাতের কথা আমার চিরকালের মতো মনে থাকবে। কখনও জোরে বাতাস দেয়, ডাল দোলে, আমি ভাবি এই বুঝি পড়লাম! ঘুম আসে, একদিকে ঝুঁকে পড়ি, আবার চমকে সোজা হয়ে বসি। ঘুম তাড়াবার আশায় মগ-ডাল থেকে মাঝখানের ডালে, সেখান থেকে নীচের ডালে ওঠা-নামা করতে লাগলাম। নিজের দুঃখে বুক ফেটে যেতে লাগল। কিন্তু একসময় সেই দুঃখের রাতেরও শেষ হল। আমি গাছ থেকে নেবে, গাছের ডালে পাথর দিয়ে নিজের নাম লিখে, গাছের গোড়ায় জুতো জোড়া ত্যাগ করলাম। তারপর গাছের একটা সরু ডাল ভেঙে লাঠি তৈরি করে, হালকা শরীরে রওনা হলাম। যেদিকে কম গাছ দেখলাম, সেইদিকে চললাম। কিছুদূর যেতেই একটা পাহাড়ি নদী পেলাম, তার ভীষণ স্রোত। নদীর ধার দিয়ে এগোতে লাগলাম, পা কেটে রক্ত পড়তে লাগল। যেদিকে চোখ যায় চলেছি, মস্ত একটা খোলা জায়গায় পড়লাম, সেখানে বড় বড় শিংওলা হরিণের দল চরছে। তারপর ফাঁকা ফাঁকা জঙ্গল, তারপর একটা বড় নদী। বেলা গড়িয়ে গেছে, খিদেয় পেট জ্বলছে।

গাছে নানা ফল দেখলাম। কিন্তু কোনটা ভালো আর কোনটা বিষফল, তাও জানি না—খাই কোন সাহসে? তারপর একটা লতাগাছ চোখে পড়ল। নৈনিতালের দিকে যাবার সময় টাট্টুওলা বলেছিল এই লতার গোড়া খুঁড়লে, মিষ্টি শিকড় পাওয়া যায়। লতার গোড়া খুঁড়ে সত্যি শাঁকালুর মতো শিকড় খেয়ে খিদে মেটালাম। নদীর ধারে একটা মসৃণ পাথরে শুয়ে একটু বিশ্রাম করব ভেবেছিলাম। কিন্তু যেমনি শোয়া, অমনি গভীর ঘুম। যখন ঘুম ভাঙল, তখন সন্ধে হয়ে গেছে, আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে।

আবার রাত কাটাবার জন্যে একটা সুবিধেমতো গাছ খুঁজে বের করে, তার অর্ধেকটা উঠেছি, এমন সময় আমার পাশ দিয়ে গাছের গুঁড়ি বেয়ে, সড়সড় করে একটা প্রকাণ্ড সাপ নেবে গেল। ভয়ে আমার প্রাণ বেরিয়ে যায় আর কী! লাঠিটা দিয়ে আচ্ছা করে গাছটাকে পেটালাম, আর সাপ বেরোল না দেখে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

কিন্তু যত রাত বাড়ে, ততই শীত পড়তে লাগল। নৈনিতাল পাহাড়ের কাছাকাছি জায়গা, শীত তো হবেই। ঘুম আর এলো না, সারারাত শীতে কাঁপতে কাঁপতে, বনের মধ্যে কতরকম

শব্দ যে শুনতে পাচ্ছিলাম, সে আর কী বলব! শেষ রাত্তিরে শীতের চোটে গাছ থেকে নেবে তাড়াতাড়ি পাইচারি করে গা-গরম করবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

সূর্য উঠলে আবার হাঁটতে লাগলাম। পথ বলে কিছু নেই। কখনও উঁচুতে উঠি, কখনও নীচে নামি, সেখানকার জমি ঢেউ খেলানো। ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল, শীতের বদলে ঘাম ঝরতে লাগল। কোথাও নদী থেকে জল পান করে তৃষ্ণা মেটাই, কোথাও বুনো কুলগাছ থেকে কুল খেয়ে পেট ভরাই। কিছুদূর গিয়ে আবার ঘাসে-ঢাকা খোলা মাঠ, সেখানে বড় বড় নীলাভ গাই চরছে। আমাকে দেখেই তারা দৌড় দিল। এক জায়গায় একসঙ্গে ৫০০ ময়ূর দেখলাম। তবু এগিয়ে চলেছি, ক্রমে গাছপালা পাতলা হয়ে এলো, তারপর দেখি সামনে গভীর খাদ। এদিকে সন্ধে হয়ে আসছে, আমার ভাবনার আর শেষ নেই। ভগবানকে ডাকতে লাগলাম, ভয় কমে গেল, রাত কাটাবার জন্যে আবার একটা সুবিধা-মতো গাছ খুঁজতে লাগলাম। কী জানি কেন—সে-রাতে ততটা কষ্ট মনে হল না।

পরদিন সকালে আবার চলতে লাগলাম। মাঠ নদী গাছপালা, তারপরে হঠাৎ দেখি শস্যখেত। নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না, ভালো করে চেয়ে দেখি বাস্তবিকই শস্যখেত, তার একধারে একজন বৃদ্ধা কুলোর বাতাস দিয়ে শস্য থেকে খোসা ভুসি ওড়াচ্ছে। আমি ছুটে গিয়ে তার পায়ে পড়লাম।

সে-যাত্রা ওখানে আমার দুঃখের শেষ হল। বুড়ি আমাকে তার নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে খাইয়েদাইয়ে সুস্থ করল, তারা বাড়িসুদ্দু সকলে আমার সব কথা শুনে সমবেদনায় চোখের জল ফেলতে লাগল। আমারও বুক জুড়োল। ঘি, দুধ, দই, ছানা, গুড়, সন্দেশ, ক্ষীর খেলাম। গায়ে চাদর নেই, ওরা আমাকে একখানি মোটা চাদর দিল। শোবার জন্যে খাটিয়া পেতে দিল, কম্বল দিল। এত কষ্টের পর আমি সুখে ঘুমোলাম।

পরদিন তাদের অনেক পেড়াপেড়ি সত্ত্বেও আবার রওনা হলাম। বিদায় নেবার সময় বুড়ির হাতে একটা মোহর গুঁজে দিলাম। সে কিছুতেই নেবে না, জোর করে দিলাম। বললাম, 'তোমাকে মা বলে ডেকেছি, ছেলের দেওয়া জিনিস তোমাকে নিতেই হবে।'

যাবার সময়, তারাও জোর করে চাদর, কাপড়, কম্বল সঙ্গে দিল।

যাবার পথ বলে দিল, কিছুদূর এগিয়েও দিল।

এদের স্নেহের কথা ভুলবার নয়।

৪

আবার বেরিলিতে ফিরে এলাম। এত কষ্ট পেয়েও কোনও কাজ হল না। শহরে ঢুকেই প্রথমেই যে চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হল, সে বলল, 'বাবু, কেন এলেন? এ-জায়গা ভালো নয়। আপনি এসেছেন জানতে পারলে, নবাবের সিপাইরা আপনাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দেবে। আপনার ভাই কাশীপ্রসাদ আর কয়েকজন বাঙালিকে খাঁ বাহাদুর খাঁ কয়েদ করেছে।'

এই লোকটাই লুকিয়ে আমাকে হাফেজ নিয়ামৎ খাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিল। ইনি আমার বহুদিনের পুরনো বন্ধু, ইংরেজদের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং চুন্না মিঞার বাবা। তাছাড়া ইনি খাঁ

বাহাদুর খাঁর বেয়াই। হাফেজ নিয়ামৎ খাঁ আমাকে নিজের সন্তানের মতো আদর-যত্ন করলেন। থাকবার, রাঁধাবাড়া করবার আলাদা ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু একটা সংবাদে মনটা একেবারে মুষড়ে পড়ল। কাশীর আর অন্য ছ'জন বাঙালির নাকি ফাঁসির হুকুম হয়েছে।

কার কাছে সাহায্য চাইব, হাফেজ নিয়ামৎ খাঁর কাছে ছাড়া? তাঁর ছোট ছেলে ছম্মন খাঁর সঙ্গে খাঁ বাহাদুর খাঁর বড় আদরের একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছিল, সেইজন্য বেয়াইয়ের কথা খাঁ বাহাদুর খাঁ সহজে উপেক্ষা করতে পারতেন না। বেয়াই এবার বুদ্ধি করে ছেলে আর পুত্রবধূকে পাঠিয়ে খাঁ বাহাদুর খাঁর কাছ থেকে কাশীর আর ছ'জন বাঙালির প্রাণ ও মুক্তি চেয়ে নিলেন। ওঁদের কথা খাঁ বাহাদুর খাঁ ঠেলতে পারলেন না।

ভোরে ছম্মন এসে আমাকে সুখবর দিলেন। বললেন, 'ওরা বোধহয় এতক্ষণে কারাগার থেকে রওনা হয়ে গেছে। এবার আপনিও তৈরি হন, দু'-ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে। আমি নিজে আপনাকে শহরের বাইরে পৌঁছে দেব।'

তখন আমি একটা মোহর ভাঙিয়ে দরকারি জিনিসপত্র একজন কর্মচারীকে দিয়ে কেনালাম। বটের পাখি শিকার করতে যাবার অজুহাতে ছম্মন আমার সঙ্গে প্রায় পাঁচ-ছ'মাইল এলেন, তারপর বিদায় নিলেন। একজন লোক বাঁকে করে আমার জিনিসপত্র নিয়ে আমার সঙ্গে চলল। বেলা এগারোটা নাগাদ পথের ধারে একটা কুয়োর পাশে দেখি কাশী আর ছ'জন বাঙালি ভদ্রলোক আমার অপেক্ষায় বসে। কাশী তো আমাকে দেখে কেঁদে আকুল।

কাশীদের সঙ্গে চারজন সিপাই পাহারা ছিল। চারটে টাকা দিয়ে ওদের বিদায় করে, আমরা রামপুরের নবাবের এলাকার দিকে চললাম। তিনি ইংরেজদের বন্ধু ছিলেন। বেলা একটায় মিলাক্ বলে একটা জায়গায় পৌঁছলাম, এখান থেকেই রামপুরের এলাকা শুরু হয়েছে। ওখানে জিনিসপত্র কিনে আমরা রাঁধাবাড়া করে পেট ভরে খেলাম। ততক্ষণে সন্ধের আর বেশি দেরি নেই। কাজেই সে-রাতটা কাটিয়ে, পরদিন ভোরে রামপুরের দিকে রওনা হলাম।

আমরা চাই সেদিনই রামপুর পৌঁছতে। তাই সূর্যের প্রচণ্ড তেজ গ্রাহ্য না-করে এগিয়ে চললাম। অবশেষে ক্লান্ত শরীরে রামপুর শহরের সীমানায় চমৎকার একটা বাগানে এলাম। আমাদের তাই দেখে কী, যে আনন্দ হল সে বলবার নয়। ফুল শুঁকে, ঘাসে গড়াগড়ি দিয়ে আনন্দ করতে লাগলাম। এমন সময় দু'জন মালি এসে বকাবকি শুরু করে দিল। তাই শুনে হুঁকো-হাতে লম্বা-দাড়ি একজন লম্বা-চওড়া মুসলমান এসে মালিদের বলল, 'বের করে দাও এদের। এ কি সরাইখানা পেয়েছে!'

মালিরাও আশকারা পেয়ে আমাদের যা-তা বলে গাল দিতে লাগল। আমরা তাড়াতাড়ি কম্বল গুটিয়ে, যাবার উদ্যোগ করতে লাগলাম। হঠাৎ সেই দাড়িওলা ভদ্রলোক চোখ লাল করে, আমার কাছে উপস্থিত। আমি ভাবছি, এ আবার কী হাঙ্গামা বাধায়, এমন সময় হুঁকো ছুড়ে ফেলে দিয়ে লোকটা ভক্তিভরে সেলাম করে বলল, 'বাবুসাহেব, আপনার এ কী হাল হয়েছে?'

সে-লোকটা আর-কেউ নয়, বেরিলির সেই দফাদার, যে রাতারাতি পালিয়ে গিয়েছিল। এরপর আর আমাদের কোনও ভাবনা রইল না, দফাদার আমাদের আদর-যত্নের কোনও ত্রুটি রাখল না। দুষ্টু মালিরাও পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিল! আমার পুরনো সেতারের মাস্টার আবদুল রহিমও দেখি খবর পেয়ে, একজন বামুনের কাঁধে লুচি, কচুরি, বরফি, অমৃতি, দই,

ক্ষীর চাপিয়ে এনে হাজির। খাওয়াদাওয়ার পর সেতার-বাজনা যা শুনলাম, তার তুলনা হয় না।

ঠিক হল বাসা ভাড়া করে রামপুরে তিনদিন বিশ্রাম করব। তারপর কাশীপুর যাব, সেখানে হরদেব আর হরগোবিন্দদাদারা আছেন—বিদ্রোহের হাঙ্গামা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। কাশীপুর পৌঁছতে হাঁটা-পথে দু'-দিন লাগল। দাদারা নৈনিতাল গেছেন, বৌদিদিরা আমাদের অবস্থা দেখে কেঁদে ভাসালেন। চান নেই, সময়-মতো খাওয়া নেই, রোদে পুড়ে, বিশ্রাম না-করে সে যা চেহারা!

শুনলাম নৈনিতালের সায়েবরা আমার খোঁজ করেছেন। বিকেলে কাশীপুরের রাজা শিবরাজ সিংহের সঙ্গে দেখা করলাম। ইনিও ইংরেজদের বন্ধু। রাজা আমার সব কথা শুনে সহানুভূতি জানালেন, তারপর বললেন—আমাকে পরশুদিন নৈনিতালে যেতে হবে ইংরেজদের জন্যে ২৫ হাজার টাকা নিয়ে। সঙ্গে লোকজন যাবে, কাল সব ব্যবস্থা হবে। এতদিন রাজা একজন বিশ্বাসী লোকের অপেক্ষাতেই ছিলেন। এমনিতেই খালি হাতে নৈনিতাল পৌঁছনো দায়, তার ওপর অতগুলো টাকা নিয়ে যাবার কথা শুনেই তো আমি থরহরি কম্পমান। অথচ মনে মনে জানি—নিতে অস্বীকার করাটা কাপুরুষতা। অতএব রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু যাবার আগের মুহূর্ত অবধি কাশী বা আর-কাউকে কিছু না-বলাই ভালো মনে হল।

রাজা আমাকে গোপনে জানালেন—আমার সঙ্গে খুব বেশি লোক দিতে পারবেন না। কারণ, খাঁ বাহাদুর খাঁ তাঁর রাজ্য আক্রমণ করবেন বলে শাসাচ্ছেন। কাজেই কিছু সৈন্য নিজের রাজ্য রক্ষার জন্য রাখা কর্তব্য। তবে আমার সঙ্গে ২৫জন বাছাই-করা অশ্বারোহী, টাকা বইবার জন্য দুটো হাতি একজন হাবিলদার, দু'জন কর্মচারী, তাছাড়া পথ-দেখাবার গাইড, চাকরবাকর এবং রাঁধবার লোক যাবে।

কাশীকে না-জানিয়ে সব ব্যবস্থা হল। যাবার আগেও তাকে বললাম—খাজনা আদায়ের জন্যে রাজার অন্য জমিদারিতে যাচ্ছি, সাতদিন বাদে ফিরব।

কাশীপুর শহর থেকে আমরা দল বেঁধে বেরোলাম না, পাছে জানাজানি হয়ে যায়। সকলের সৈনিক-বেশ, হাতির যুদ্ধের সাজ। একে একে রওনা হয়ে, শহরের বাইরে চার মাইল দূরে সকলে একসঙ্গে মিললাম।

আমি হাতিতে গেলাম কয়েক হাজার টাকা নিয়ে। অন্য হাতিতে একজন বুড়ো হাবিলদার, বাকি টাকা নিয়ে। সে একজন পাকা যোদ্ধা আর বিষম সাহসী। তার কাছে শুনলাম তিনদিন ঘোর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। সে যে কী ঘোর জঙ্গল, সে-আর কী বলব। ১২ মাইল যাবার পর দেখি—চারদিকে কেবল সিদ্ধিগাছ, এরকম আর-কখনও দেখিনি।

সিদ্ধির জঙ্গল পেরিয়ে, ঘন গাছপালার মধ্যে দিয়ে কিছুদূর পথ কেটে গেলাম। বেলা থাকতে একটা ঝরনার ধারে পৌঁছলাম। গাইডরা বলল এখানেই রাত কাটাতে হবে। কারণ, এর পর ১২ মাইলের মধ্যে জল পাওয়া যাবে না। এই জায়গায় অনেক উঁচু উঁচু পাহাড়ি গাছ দেখলাম।

রাত হতে ঢের দেরি, বুড়ো হাবিলদার আমাকে নিয়ে হরিণ-শিকারে বেরোলেন। দুটো হরিণ মারা হল। রাত্তিরে আটার রুটি আর হরিণ-মাংসের কালিয়া সকলে মহানন্দে খেলাম।

সে-রাতে আমরা গাছতলায়, নিজেদের বিছানার নীচে টাকা লুকিয়ে, ধুনি জ্বেলে, পাশে বন্দুক নিয়ে শুলাম। সারারাত সশস্ত্র প্রহরীরা পালা করে পাহারা দিল। ভোরে আবার রওনা হলাম। আবার সেই অন্ধকার ঘন বনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া, গাইড আবার সাহস দিয়ে বলতে লাগল, 'এ-পথে কোনও ভয় নেই, বিদ্রোহী নেই, ডাকাত নেই। এক যা বাঘ বেরোয়!'

বাঘেদের সঙ্গে দেখা হল না! বেলা সাড়ে তিনটেয় একটা বড় ঝরনার ধারে থেমে চান করলাম, আহ্নিক করলাম। গাইড মাছ খাওয়াবে বলে ভরসা দিয়েছিল। সে এবার মাছ ধরবার জোগাড় করতে লাগল। মাটি ও পাথর দিয়ে ঝরনার স্রোত একটু সরিয়ে, যেখানে অল্প অল্প জল পড়ছে, সেখানে দু'-তিনটে পাথর উল্টোতেই তলা থেকে দেড়-পোয়া একটা মাছ পাওয়া গেল। এইভাবে গোটা ছয়-সাত জোগাড় করে নিজেই রেঁধে খেলাম। দলের আর-কেউ মাছ ছোঁয় না, রাঁধুনে বামুনরাও নয়।

আগের রাতের মতো সে-রাতটাও কাটল। সে-রাত থেকে দারুণ শীত করতে লাগল। আমরা নৈনিতাল পাহাড়ের কাছে এসে গেছি, নীল মেঘের মতো ওই পাহাড় দেখা যাচ্ছে। বেলা তিনটেয় রহিলখণ্ডের কমিশনার অ্যালেকজ্যান্ডার সায়েবের বাড়িতে পৌঁছলাম। আমাকে দেখে সকলেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেলেন। নৈনিতালের ইংরেজরা আদর করে অভ্যর্থনা করলেন। মতিরাম সাহের গদিতে টাকা জমা দিলাম। এখানকার সায়েবদের অবস্থা বড় কাহিল! টাকা নেই, খাবার ভালো ব্যবস্থা নেই, যথেষ্ট গোলাবারুদ সৈন্যও নেই। এদিকে খুব কাছেই কালাডুঙ্গির আশেপাশে বিদ্রোহীরা ঘাঁটি করেছে। ইংরেজদের একমাত্র সহায় একদল গুর্খা সিপাই।

আমার সঙ্গীরা সেনানিবাসে গেল, আমি গিয়ে হরদেবদাদাদের বাড়িতে উঠলাম। দাদারা আমার শরীরের অবস্থা দেখে ভারী দুঃখিত হলেন। তখুনি আমার আদর-যত্নের ব্যবস্থায় লেগে গেলেন। সন্ধেবেলায় সায়েবের বাড়ি গেলাম। দেখে আশ্চর্য হলাম যে গুপ্তচরদের কাছ থেকে আমার বিষয় সব কথাই তাঁদের কানে গেছে। ইংরেজদের এদেশি গুপ্তচররা যেমন দক্ষ, তেমনি সাহসী।

ইংরেজদের অবস্থা সঙ্গীন হলেও, সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নয়। বিদ্রোহীরা তিন-চার হাজার সৈনিক আর আট-দশটা তোপের সাহায্যে অনায়াসে নৈনিতাল দখল করতে পারত। কিন্তু তারা হলদোয়ানিতে ওত পেতে রইল। ইংরেজদের রসদ যাবার পথ বন্ধ করতে পারলে এরা আর দাঁড়াতে পারবে না—এই আশায়।

নৈনিতালে ইংরেজদের আসল দরকার অশ্বারোহী সৈনিকের। রেশালার হিসেব রাখা আমার কাজ। তবু আমি ঘোড়ায় চড়তে, বন্দুক ছুড়তে, সৈন্য চালাতে দক্ষ। কমিশনারসায়েব বলে বসলেন—আমাকেই তাঁদের অশ্বারোহী রেজিমেন্ট গড়ে দিতে হবে। নৈনিতালে যে অফিসাররা আছেন, তাঁরা কেউ রেশালার কাজ সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

এই বিপদের সময় নৈনিতালে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের স্বার্থত্যাগ আর সাহসের প্রশংসা করতে হয়। যৎসামান্য মাইনে নিয়ে, প্রাণ হাতে করে তাঁরা উদয়াস্ত খেটে যাচ্ছিলেন। আমার ঘাড়েও তখন যুদ্ধের ভূত চাপল। যুদ্ধ ছাড়া আর-আমার কোনও চিন্তা রইল না।

আমরা পৌঁছবার ১৯ দিন পরে কাশীপুরের রাজার কাছ থেকে দু'শো ঘোড়সোয়ার এসে পৌঁছল। এর বেশি তখন তাঁর পক্ষে পাঠানো সম্ভব ছিল না। এদিক-ওদিক করে ৩০০

অশ্বারোহী নিয়ে শিক্ষাকার্য শুরু করব ঠিক করলাম। আমার পরামর্শে চারজন ইংরেজ অফিসার আর আমি, ওই ৩০০ ঘোড়সোয়ার আর লোকজন নিয়ে কালাডুঙ্গিতে গিয়ে আড্ডা গাড়লাম। ওখানে বিদ্রোহীরা কেউ ছিল না বটে, কিন্তু এক জায়গায় গাছ কেটে জমি সমান করা রয়েছে দেখলাম—যেন এইখানে কেউ শিবির করবার ব্যবস্থা করে রেখেছে, কোদালের দাগও দেখতে পেলাম। বিদ্রোহীরাই নিশ্চয়ই এ-কাজ করেছে। এখানে আমাদের দেখে ওদের পিত্তি জ্বলে যাবে সন্দেহ নেই।

ওইখানেই তাঁবুগুলি ফেলা হল, অশ্বারোহী দলের সেনাপতি হলেন কর্নেল ক্রশম্যান। ঠিক হল স্থানীয় পাহাড়িদের রেশালার কাজ শেখাতে হবে। নইলে আমরা লোক পাব কোথায়? আপাতত দুটো ঘাঁটি বসানো হল, যাতে বিদ্রোহীরা এগোলে সময় মতো আমরা খবর পাই। কর্নেল ক্রশম্যান কালাডুঙ্গিতে থাকবেন না। থাকবে ওই ৩০০ অশ্বারোহী, বারওয়েল আর হন্টার বলে দু'জন ইংরেজ অফিসার, আমি, ডাক্তার নন্দকুমার মিত্র আর চাকরবাকর ইত্যাদি।

কালাডুঙ্গিতে ইংরেজদের তৈরি দুটো বাংলো ছিল। তার বড়টাতে সায়েবেরা দু'জন রইলেন, ছোটটা আমাকেই দেওয়া হল। কিন্তু তাঁবুতে ডাক্তারের সুবিধা হচ্ছে না দেখে, তাঁকেও আমার বাংলোয় নিয়ে এলাম।

আমার বাড়ি থেকে কিছু দূরে প্যারেড গ্রাউন্ড হল, কাজও শুরু হল। রোজই দু'-চারজন লোক সৈন্যদলে ভর্তি হয়। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা পদাতিক হতে চায়। তাদের মধ্যে থেকে রেশালার লোক জোগাড় করা মুশকিল। বেজায় খাটতে হত আমাকে। কোনও কোনওদিন রাত ভোর হয়ে যেত, তবে কাজ শেষ হত।

এত খাটুনিতেও শরীর ভালো হতে লাগল। খেতাম ভালো, প্রচুর দৌড়ঝাঁপ করতে হত, মনে ছিল উৎসাহ। ওদিকে নন্দডাক্তারের শরীর যেমন দুর্বল, ভিতুও তেমনি। তাঁকে নিয়ে অনেক মশকরা করতাম। প্রথমটা তিনি ঘোড়ায় চড়তে পর্যন্ত ভয় পেতেন। শেষে কিন্তু একজন ভালো অশ্বারোহী হয়ে উঠেছিলেন।

একদিন বেলা চারটের সময় সৈনিকরা প্যারেড করতে যাচ্ছে, এমন সময় বিদ্রোহীরা তাদের ওপর গুলি চালাতে আরম্ভ করে দিল। আমরাও অমনি তৈরি হয়ে নিয়ে হরহর-বমবম করে বেরিয়ে পড়লাম। ওরা একটুক্ষণ গুলি চালিয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল। আমরাও ওদের পেছন পেছন প্রায় দু'-মাইল দৌড়লাম। দু'জন অশ্বারোহী আর ন'জন পদাতিককে গ্রেপ্তার করে নৈনিতাল পাঠালাম।

এই ব্যাপারের পর বারওয়েলসায়েব একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বিদ্রোহীরা চার হাজার লোক নিয়ে যে-কোনও মুহূর্তে নৈনিতাল আক্রমণ করতে পারে। আমার মনে হল—নিশ্চয়ই সাহসে কুলোচ্ছে না, তাই করছে না। আমাদের এই কালাডুঙ্গিতে যদি ছ'-সাতশো অশ্বারোহীকে শিখিয়ে তৈরি করে রাখতে পারি, আমাদের কোনও ভয় থাকবে না। দিন-রাত বারে বারে ওদের রসদ লুট করে, তাঁবু জ্বালিয়ে, গুলি চালিয়ে, একেবারে হাড় ভাজা ভাজা করে তুলব। ঘোড়া কেড়ে আনব, কামান উঠিয়ে আনব। কিন্তু তার আগে অশ্বারোহী দল বাড়াতে হবে।

ওই ব্যাপারের পরেরদিনই রামপুরের নবাব দেড়শো অশ্বারোহী পাঠালেন। তারপর দিন কাশীপুরের রাজার আরও ১০০ সোয়ার এসে উপস্থিত হল। আমাদের অশ্বারোহীর সংখ্যা এখন ৫৫০। এদের প্রাণপণে তৈরি করতে লাগলাম।

এক সপ্তাহ বাদে শেষরাত্রে বিদ্রোহীরা আমাদের প্রথম ঘাঁটি আক্রমণ করে। ওখানকার ৫০জন লোকের মধ্যে ৩২জনকে মেরে ফেলল। অবিশ্যি ওদের নিজেদের লোকও ৫০জন মারা গেছিল।

এবার আমরা সত্যি-সত্যি হলদোয়ানি আক্রমণ করার কথা ভাবতে লাগলাম। আমাদের অশ্বারোহীরা খুব ভালোভাবে তৈরি হয়েছে, যুদ্ধ করতে তাদের আগ্রহও অসীম। বিদ্রোহীদের অবস্থান, সেনাবল, অভিসন্ধি সম্পর্কে সঠিক খবর আনবার জন্যে আটজন গুপ্তচরকে ছদ্মবেশে পাঠানো হল। এরা সব চালাকের একশেষ—কেউ সাজল সন্ন্যাসী, কেউ নাপিত, কেউ গোয়ালা। এদের কাজ একেবারে শত্রুপক্ষের ভেতরে ঢুকে, কাঁচা খবর আনা। এর জন্যে অনেক সময় ওদের প্রাণ পর্যন্ত দিতে হত।

বেরিলি থেকে একজন গুপ্তচর অরাজকতা অত্যাচারের খবর আনল, অন্যরা আর ফিরল না। হলদোয়ানির খবর আনল ভিখিরির বেশে একজন গুপ্তচর। আমিও তাকে চিনতে পারিনি—লম্বা চুল-দাড়ি, গালে গোটা তিন নকল আঁচিল, কুচকুচে কালো রং, চেনা কঠিন বটে। সে নাকি একজন বহুরূপীর কাছে ছদ্মবেশ ধরতে শিখেছিল। তার কাছে শুনলাম খাঁ বাহাদুর খাঁর কাছে তাড়া খেয়ে ফজল হক কালাডুঙ্গি আর নৈনিতাল আক্রমণ করবেন বলে ঠিক করেছেন।

তারপর গুপ্তচর আমাদের চতুর পরামর্শ দিল। তিনদিন পরে সে হলদোয়ানিতে ফিরে যাবে। বিদ্রোহীদের ধারণা সে তাদের লোক। সেদিনই রাত্তিরে সে গাইড হয়ে কালাডুঙ্গি আক্রমণের জন্যে বিদ্রোহী সিপাইদের পশ্চিমদিকের বাঁকা পথ দিয়ে নিয়ে আসবে। আমাদের কাছাকাছি গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। যেই তারা সামনে আসবে, তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সমস্ত কাজটা খুব সাবধানে করা চাই, যাতে আমাদের নিজেদের অশ্বারোহীরাও আগে থেকে কিছু না-জানে।

যেমন কথা, তেমনি কাজ। পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি যুদ্ধ হয়েছিল বলে মনে হয় না। আচমকা আক্রমণে বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল, যে যেদিকে পারল পালাল। কিন্তু ৮০জন মারা পড়ল। আমাদের মাত্র পাঁচজন কাটা পড়েছিল।

এই জয়লাভের জন্যে ওই গুপ্তচরের কাছে আমরা ঋণী। সে-রাতে অন্ধকারে চিনতে না-পেরে আমাদের সৈনিকরা ওকেও আক্রমণ করেছিল। পায়ে খুব লেগেছিল, পরদিন খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে হাজির! ওষুধপত্র দেওয়া হল।

এর পরে আরও পাঁচবার বিদ্রোহীরা আক্রমণের চেষ্টা করেছিল। আমরা গুপ্তচরের কাছে আগেই খবর পেয়ে হৈ-হৈ করে বেরিয়ে পড়ে, তাদের মতলব ফাঁসিয়ে দিলাম। এদিকে রামপুরের কাছ থেকে আরও ১৭৫জন আর কাশীপুর থেকে ১০০জন অশ্বারোহী এসে পৌঁছল। এই ৮০০-রও বেশি সোয়ারদের কোথায় থাকতে দেব, কী খেতে দেব, গরম জামা কোথায় পাব, সেই হয়ে উঠল এক মহাভাবনা। শেষে অপারগ, রুগ্ন আর বুড়োদের ছুটি দিয়ে সংখ্যাটা কিছু কমানো গেল।

এমন সময় খবর এলো—বিদ্রোহীরা হলদোয়ানি ছেড়ে চলে গেছে ১৭-১৮ মাইল দূরে, চারপুরায়। যে-গুপ্তচর খবরটা এনেছিল, সে বলতে লাগল—এই হল ওদের আক্রমণ করবার উপযুক্ত সময়, এমন সুযোগ আমাদের ছাড়া উচিত নয়।

www.boiRboi.blogspot.com

অনেক পরামর্শের পর ঠিক হল, এক্ষুনি ওদের আক্রমণ করে কাজ নেই, আপাতত হলদোয়ানি দখল করা যাক। পরদিন সকালে ৪০০ গুর্খা পদাতিকের সঙ্গে আমরা ৭০০ অশ্বারোহী ব্যান্ড বাজিয়ে হলদোয়ানি অধিকার করলাম।

এই সেই হলদেয়ানি—যেখানে ওই ফজল হকই একদিন আমাকে নাকালের একশেষ করেছিল। দোকানঘরগুলো ভাঙা, কোথাও জনমানুষ নেই, ভীষণ শীত। খুঁজে দেখা হল শত্রুরা কোনও ব্যবহারযোগ্য জিনিস ফেলে গেছে কিনা। কয়েক বস্তা আটা আর কয়েক হাঁড়ি উৎকৃষ্ট ঘি ছাড়া কিছু পেলাম না।

তারপর আবার সেই একঘেঁয়ে জীবন চলতে লাগল। সেই ড্রিল, সেই প্যারেড. সেই ডাল রুটি মাংস। খবরের জন্যে গুপ্তচরদের ওপর নির্ভর করতে হত, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বানিয়ে বাজে খবর দিত, বিদ্রোহীদের ধারে-কাছেও যেত না। শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে আমরা প্রমাণ চাইতে আরম্ভ করলাম। বিদ্রোহীদের সেনানিবাসের কাছে একরকম গাছ ছিল, সে-গাছ অন্য কোথাও পাওয়া যেত না। যে-গুপ্তচর ওই গাছের পাতাসুদ্দু একটা ছোট ডাল সঙ্গে না-আনত, তার কোনও কথা আমরা শুনতাম না।

একদিন হঠাৎ এক বুড়োর সঙ্গে একজন সুন্দরী মেয়ে এসে আমাদের গান-বাজনা শোনাতে লাগল। যেমনি গলা, তেমনি চমৎকার বাজনা। মেয়েটা কে, তা জানবার জন্যে আমরা সকলেই উৎসুক। মেয়েটা নাকি কারও সঙ্গে কথা বলে না। হঠাৎ একটা অদ্ভুত গান ধরল, তার বাংলা করলে অনেকটা এইরকম দাঁড়ায়।

'শুনো হে রাজন অমিয় বচন,
হয়েছে যে আজ দিল্লির পতন।
বাদশা বেগমে ইংরেজ চরণে
লুটিয়ে পড়েছে, লয়েছে শরণ।'

গান শুনে আমরা সবাই স্তম্ভিত, বার বার ওকে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, 'এ-কথা কি সত্যি? সত্যিই কি দিল্লির পতন হয়েছে?'

মেয়েটা সেতার নাবিয়ে হাতজোড় করে বলল, 'বাবুসাহেব, কী, আমাকে চিনতে পারলেন না?' এই বলে মেয়ের সাজ সে খুলে ফেলল। দেখি সে একজন গুপ্তচর। বেরিলির মিশ্র বৈজনাথের লোক, আমার চেনা!

সে বলল বেরিলি শহরের সবাই খবরটা জানে, যদিও খাঁ বাহাদুর খাঁ কথাটাকে চাপা দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কেউ কিছু বলতে গেলে বিষম রেগে উঠছেন। নানারকম মিথ্যে ভড়ং দেখাচ্ছেন।

আমরা গুপ্তচরকে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করতে বলাতে সে বলল, 'এটা বিশ্রামের সময় নয়। কর্নেল ক্রশম্যানের সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।'

কর্নেল ক্রশম্যান তখন নৈনিতালে, আমরা কয়েকজন অফিসার ও ঘোড়সোয়ার গুপ্তচরের সঙ্গে সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখি সায়েবরা দরজা বন্ধ করে গোপন পরামর্শ করছেন। সভা ভঙ্গ হলে তাঁরা বেরোলেন।

www.boiRboi.blogspot.com

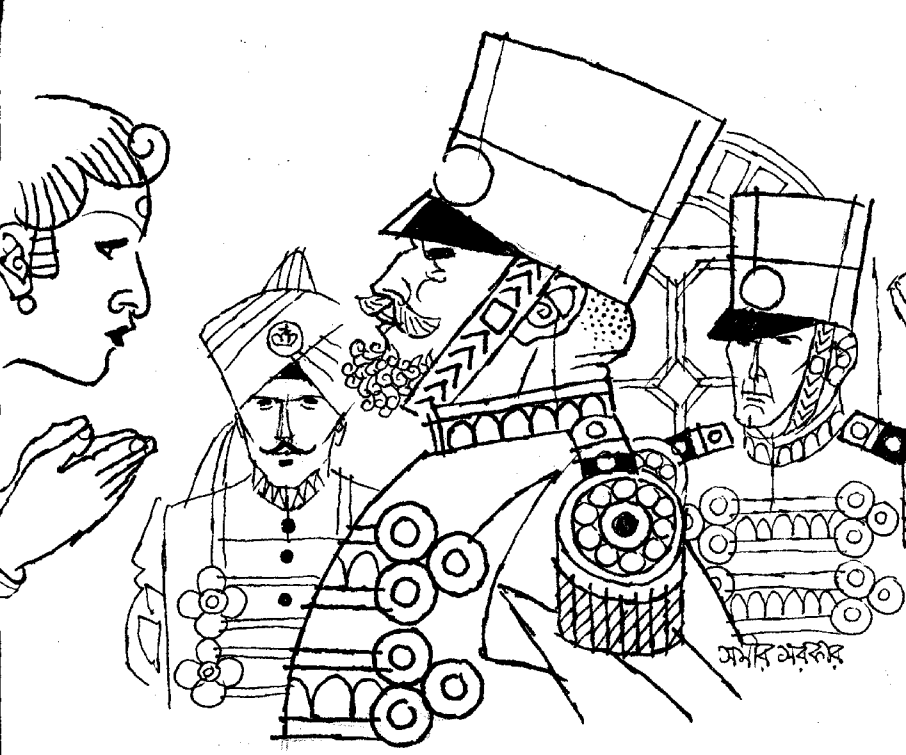

গুপ্তচর জোড়হাতে বলল, 'দিল্লির পতন হয়েছে বটে, কিন্তু নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁ ১৬ হাজার সৈন্য নিয়ে হলদোয়ানি আর নৈনিতাল আক্রমণ করতে আসছেন। দু'-দিনের মধ্যে তাঁরা হলদোয়ানি ঘিরে ফেলবেন।'

কর্নেল ক্রুশম্যান বললেন, 'তোমার খবর ঠিক। কাল আমরাও এ-কথা শুনেছি।'

আবার মন্ত্রণা সভা বসল।

আমরা সেই রাতেই হলদোয়ানি ফিরে এলাম। পরদিন সকালে নৈনিতালের প্রায় সব সায়েবরাই হলদোয়ানিতে জড়ো হলেন। ঠিক হয়েছিল সেই রাত্তিরেই বিদ্রোহীদের আক্রমণ করা হবে। আমি নিজে ৩০০ অসমসাহসিক অশ্বারোহীকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করে রাখলাম। কামান, গোলা-গুলি, বারুদ, বন্দুক, ওষুধপত্র, আহতদের হাসপাতালে নিয়ে আসবার জন্যে ডুলি ও ডাণ্ডি—সমস্ত ব্যবস্থা রাখলাম। ডাক্তার নন্দকুমার মিত্রও প্রস্তুত হয়ে রইলেন। দরকার হলেই আরও সৈনিক যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে তৈরি হয়ে রইল।

www.boiboi.blogspot.com

রাত দশটায় যাত্রা করা হবে। ঘোড়সোয়াররা ঘোড়ায় আর পদাতিকরা হাতির পিঠে যাবে। কোনও বাঁশি বা বিউগ্‌ল্‌ বাজানো হবে না। হঠাৎ গিয়ে ওদের ওপর পড়তে হবে। সাড়ে-ন'টার সময় আরেকজন চর শত্রুশিবির থেকে এসে খবর দিল—বিদ্রোহীদের সাজপোশাক অবিকল ব্রিটিশ সেনাদের মতো! এ তো মহা মুশকিল! রাতের অন্ধকারে শত্রুমিত্র চেনা যাবে কী করে? আমি তাড়াতাড়ি বাজার থেকে দু'-থান সাদা কাপড় কিনে, ছ'ইঞ্চি চওড়া, দু'ফুট লম্বা ফালি করে ছিঁড়ে ফেললাম। আমাদের সৈনিকদের বলা হল দু'-হাতে বাজুর মতো সাদা কাপড় বেঁধে নিতে হবে, তাই দিয়ে তাদের চেনা যাবে।

শেষপর্যন্ত আমরা নিঃশব্দে রওনা হলাম। রাত একটার সময় ন'মাইল পথ পার হয়ে একটু বিশ্রাম নেওয়া হল। তারপর আবার যাত্রা। ভোর চারটের সময় বিদ্রোহীদের প্রথম ঘাঁটিতে পৌঁছলাম। সেখানে জনা ত্রিশেক প্রহরী ছিল। তাদের পরাস্ত করতে আমাদের বেশি সময় লাগল না।

এই জায়গা থেকে চারপুরা মাইল তিনেক দূরে। যখন সূর্যের প্রথম আলো দেখা দিল, আমরা শত্রুশিবির থেকে এক মাইল দূরে একটু নিচু জায়গায় ছাউনি করলাম। এবার কী কর্তব্য, তাই নিয়ে পরামর্শ হল। সংখ্যায় ওরা আমাদের ২৫গুণ, কাজেই বেশি কাছে যাওয়াটা বুদ্ধির কাজ হবে না। বরং দূর থেকে কামান দাগাই ভালো মনে হল।

আমরা শূন্যে একবার ফাঁকা কামানের আওয়াজ দিলাম। অমনি বিদ্রোহীরা আমাদের দিকে কামানের গোলা ছুড়তে আরম্ভ করল। জায়গাটা নিচু, কাজেই গোলা আমাদের পাঁচ-সাত হাত উঁচু দিয়ে যেতে লাগল। শেষে যখন আরও নিচু করে ওরা গোলা ছুড়তে লাগল, আমরা মাটিতে শুয়ে পড়লাম।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ওদের গোলা সব ফুরিয়ে গেল। তখন আমরা আবার উঠে দাঁড়ালাম। দূরবিন দিয়ে ওদের তোপ কোথায় দেখে দেখে, আমরা তখন আমাদের কামানের গোলা দিয়ে সেগুলোকে উল্টে দিতে শুরু করলাম। ওদের আর গোলা নেই—কাজেই তিষ্ঠুতে না-পারে, গোলন্দাজরা ছত্রভঙ্গ হয়ে, পাশের জঙ্গলে আশ্রয় নিল।

তবু আমাদের গোলা সমানে ওদের সৈন্যদলের মধ্যে পড়তে লাগল। ওদের লাইন ভেঙে গেল, অনেকে পালাতে চেষ্টা করতে লাগল। আমরাও তোপ বন্ধ করে তখন বন্দুকের যুদ্ধ আরম্ভ করলাম। এবার একেবারে মুখোমুখি যুদ্ধ। যারা পালায়, তাদের পিছন পিছন কিছুদূর ছুটে যাই, আবার ফিরে আসি। হয়তো পিছন থেকে কেউ আক্রমণ করে, আমাদের দলের কেউ এসে বাঁচায়।

সে-যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব, চারদিকে বন্দুকের শব্দ, হাহাকার, কাতরোক্তি। চারদিকে মৃত ও আহতদের রক্তাক্ত দেহ। কাটা হাত-পা-মাথা। আর সে কী বিকট শব্দ! এখনও ভাবলে শিউরে উঠি। ওই যুদ্ধে প্রায় ১২০০ বিদ্রোহী প্রাণ দিয়েছিল।

কতবার আমার নিজেরও প্রাণসংশয় হয়েছিল। ভগবানের আশীর্বাদে এবং নিজের ও সঙ্গীদের সমর-কৌশলের জন্যে বেঁচে গিয়েছিলাম। এরিমধ্যে আদেশ হল আমাদের আহতদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তুলে আনতে হবে। চারজন সোয়ার সঙ্গে নিয়ে এই কাজে বেরিয়ে পড়লাম। প্রাণ হাতে নিয়ে এ-কাজ করতে হয়। যে-কোনও সময় শত্রুরা পেছন থেকে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। নেহাৎ আয়ু ছিল বলেই বেঁচে ফিরলাম।

যুদ্ধ এবার অন্যরকম চেহারা নিয়েছে। এখানে ওখানে, সব জায়গায় ছোট ছোট দলের মধ্যে লড়াই। আমার মাথায় আঘাত লাগল, গুলি লেগে হাঁটুর হাড় ভেঙে গেল। তবু ঘোড়ার পিঠ থেকে নাবিনি বলেই রক্ষা। আমার হাতেও খুব কম লোক ঘায়েল হয়নি!

ততক্ষণে বিদ্রোহীদের শক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে, ওদের কামানগুলোকে দড়ি দিয়ে হাতির সঙ্গে বেঁধে আমরা টেনে নিয়ে এসেছি। এমন সময় পাশের জঙ্গল থেকে দামামা বেজে উঠল। যারা সেদিকে পালিয়েছিল, তারা আবার আক্রমণ করতে আসছে। সেদিকে সাত-আটটা কামানের গোলা চালাবার পর দামামার শব্দ থেমে গেল। তখন শত্রুসেনার আর বড়-কেউ বাকি নেই। যারা বেঁচে ছিল, তাদের বেশিরভাগই ১৮-১৯ মাইল দূরে বেরিলির দিকে পালিয়ে গেল।

এমনি করে যুদ্ধ শেষ হল। জয়ডঙ্কা বাজিয়ে আমরা হলদোয়ানিতে ফিরে এলাম। আমাদের হতাহতের সংখ্যা একেবারে নগণ্য। বিদ্রোহও থেমে গেল।

আমরা বেরিলি ফিরে এলাম। দেখি শহর শূন্য, পথেঘাটে একটাও লোক নেই। দোকান বন্ধ, বড় বড় বাড়ি শূন্য খাঁ-খাঁ করছে।

আমাদের ঘোড়ার খুরের শব্দে চারদিকে বিকট প্রতিধ্বনি হচ্ছে।

রসনার ঐতিহ্য

বাংলার মিষ্টান্নের যে ঐতিহ্য তিল তিল করে গড়ে উঠেছে, তার পিছনে দাশ পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য। বাগবাজারের নবীনচন্দ্র দাশ ১৮৬৮ সালে রসগোল্লা উদ্‌ভাবন করে এর গোড়াপত্তন করেন। তাঁর পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ১৯৩০ সালে স্বাদে গুণে অনুপম আর-এক চমক সৃষ্টি করেন---রসমালাই। রসগোল্লা টিনবন্দি করার কৌশলও কৃষ্ণচন্দ্রের আবিষ্কার, যার দৌলতে বাংলার এই অতুলনীয় মিষ্টি বিশ্বের নানা প্রান্তে রসিকজনের কাছে পৌঁছে যেতে পারছে। কৃষ্ণচন্দ্রে নামাঙ্কিত কে সি দাশ প্রাইভেট লিমিটেড সরকারি স্বীকৃতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৪৬ সালে। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র সারদাচরণ কেবল নতুন মিষ্টির সংযোজন করেই ক্ষান্ত হননি, উৎপাদন পদ্ধতির আধুনিকীকরণ এবং ব্যবসার সম্প্রসারণও ঘটান। দক্ষিণ ভারতের ব্যাঙ্গালোরের শাখাটি তাঁরই উদ্যোগের ফল। বংশ-পরম্পরায় নতুন নতুন উদ্‌ভাবনার ধারাটি দাশ পরিবারে আজও অম্লান। অবিরাম দু'টি সাম্প্রতিক প্রমাণ---কলসির গড়নে তৈরি সন্দেশের ভেতর ছানার পায়েস ভরা অভূতপূর্ব 'অমৃতকুম্ভ' এবং ডায়াবেটিকদের জন্যে বিশেষভাবে বানানো নানা স্বাদের মিষ্টি।

কে সি দাশ প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা
১১ এসপ্ল্যানেড ইস্ট
দূরভাষ ২২৪৮৫৯২০

ব্যাঙ্গালোর
৩ সেন্ট মার্কস রোড
দূরভাষ ২৫৫৮৭০০৩

Children's Literature in Engl

The Cosmic Explosion
Jayant V. Narlikar / Tr. Sujatha Godb

Gotya
N. D. Tramkankar / Tr. Surekha Panai

A Night in the Wood
Leelavati Bhagwat / Tr. D. R. Bhagwa

To Catch a Thief
Gangadhar Gadgil / Tr. Sujatha Godb

The Forest Nymph
Kavi Gopalakrishnan
Tr. Indira Ananthakrishnan

Fascinating Stories
Bibhutibhusan Bandyopadhyay
Tr. Ashok Dev Choudhari

The Flying Dool
Kalvi Gopalakrishnan
Tr. Indira Ananthakrishnan

SAHITYA AKADE

Head Office
Rabindra Bhavan
35 Ferozeshah Road
New Delhi 110001

Reg
Jee
23A
Kol